

৩৪

৩
বিশ্ব
আকুলিন
আকুল মাতিন

১৭/৩/৩৭

ভাষা ও প্রকৃতির আন্দোলন

আবদুল মতিন

নন্দন প্রকাশন

ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

স্বয়ং : আব্দুল মতিন

প্রকাশনায় : লন্ডন প্রকাশন/বিএমএ ভবন
১৫/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ : কামরুল হাসান

মুদ্রণে : সপ্তর্ষি মুদ্রায়ণ, ২ ওয়্যার স্ট্রীট, উয়ারী,
ঢাকা-৩

মূল্য : দশ টাকা

ভাষা ও গ্রন্থের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলকে

পূর্ব কথা

অনেক দিন থেকে বন্ধ-বান্ধব আমাকে ভাষা আন্দোলনের ওপর বই আকারে লেখার জন্য বলছেন। ভাষা আন্দোলনের ওপর লেখার তাগিদ বোধ করলেও, এবং প্রবন্ধ আকারে কিছ, লিখলেও বই আকারে ইতিপূর্বে লিখিনি।

এবার বন্ধ, সাদেক হোসেন খোকা যখন কেবল তাগাদাই দিলেন না, তাঁরা কয়েকজনে মিলে বই ছাপাবার দায়িত্বও নিলেন, তখন বই আকারে লেখার জন্য উদ্যোগী হলাম। বই লেখার ইচ্ছা ও সংকল্প প্রকাশ করায় নজরুল ইসলাম, রশীদ খান, জালিলুর রহমান, নজির আহমেদ, দেলওয়ার হোসেন প্রমুখ বন্ধুরা এগিয়ে এসে বই প্রকাশ সম্ভব করেছেন।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে লেখা সহজ ব্যাপার না। এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও, অনেকেই লিখেছেন। বদরুদ্দীন উমর সাহেব পূর্ণাঙ্গভাবে লেখার চেষ্টা করেছেন। ভাষা আন্দোলনের ওপর তিন খন্ডে লেখা 'পূর্ব' বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' বইটি তথ্যবহুল ও যথা সম্ভব নিরপেক্ষ। তথ্যের যথার্থতার জন্য তার ঐ বই থেকে অনেক উদ্ধৃতি নিয়েছি। তাঁর এত বড় বইতে দু' চারটা তথ্যের তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক। তার পরিবেশিত তথ্যে যেখানে তারতম্য মনে হয়েছে তার উল্লেখ করেছি।

ভাষা আন্দোলনের প্রায় চল্লিশ বছর পর প্রগতিশীল মহলে সেই আন্দোলন সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রসূত পরিস্থিতি ও পরিবেশে আমাদের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বই আকারে লেখার তাগিদ বেশী ক'রে অনুভব করেছি।

আন্দোলনের এই দেশে ভাষা আন্দোলন সর্ব প্রধান বা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বললে হয়তো অতুক্তি হবে না। কিভাবে এ রকম একটা আন্দোলন বিজয়ী হয়েছিল তার শিক্ষা এদেশের ও উপমহাদেশের সমাজবিদ ও রাজনীতিবিদদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য কর্মীর মত আমারও রাজনীতিতে হাতেখড়ি এই আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা

ও জাতির সমস্যাটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যেই আমি এ সমস্যাটা দেখেছিলাম এবং এই জটিল সমস্যা সম্পর্কে একটা ধারণাও পোষণ করতাম। ১৯৪৫-৪৬ এর দিকে উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিষয়ীগত অবস্থার কারণেই আমার মনে হয়েছিল পাকিস্তান অবশ্যম্ভাবী। তখন মনে করতাম, বাংলা ও আসাম নিয়ে পাকিস্তানের যে অঞ্চল গঠিত হবে তার প্রধান জাতি হবে বাঙ্গালী সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতে আপাতত পাকিস্তান হলেও পাকিস্তানের মাধ্যমেই এ উপমহাদেশের জাতি সমস্যা সমাধানের একটা পথ পাবে, এবং যে জাতি সমস্যাকে সকলে এড়িয়ে গেল তা সম্মুখে আসবে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি সমস্যার সমাধান পাকিস্তানের একটি জাতির ক্ষেত্রে হলেও ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশের অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও সমাধান প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হবে। পাকিস্তানে তথা উপমহাদেশে তারই সূচনাটা ঘটেছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে। ভাষার প্রশ্ন জাতির ব্যাপার। সুতরাং জাতি সমস্যার বিষয়কে ধরতে হলে ভাষার বিষয়কে ধরতে হবে।

১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন সমাবেশে আমি সেই কথাটাই বলেছিলাম। সেখানে সমবেত ছাত্ররা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রস্তাবই কেবল বাস্তবায়িত করেন নাই, তাঁরা আমাকে সে কমিটির আহ্বায়কও করে দিয়েছিলেন। তাদের আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব অতি উৎসাহ ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি বলে আমার ধারণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারীর মহান আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত ও জয়যুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ও নেতৃত্বের এবং রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিল। আমার এই সংক্ষিপ্ত লেখাটাতে সেই বিষয়গুলিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কোনো রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি না। এই কমিটি সাধারণ ছাত্রদের সৃষ্টি। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারীর দুই বছর আগে আমি কেবল কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি ছাত্রদের সভায় উত্থাপন করেছিলাম। কমিটিটা সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা সমর্থিত হওয়ার জন্য সাধারণ ছাত্ররাই কমিটিটাকে চালিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। কমিটির পূর্বাগত সংগ্রামী ভূমিকার কারণে ছিল সাধারণ ছাত্রদের শক্তি। আমি সাধারণ ছাত্রদের ইচ্ছা, শক্তি ও আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলাম বলেই আহ্বায়ক হিসাবে আমি কমিটিকে ঐ সবেের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে এবং ঐ রকম একটা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলাম।

সাধারণরূপেই প্রকৃত পক্ষে অসাধারণ। সাধারণকে ধারণ করতে না পারলে অসাধারণ বা সাধারণ কিছুই করা যায় না। ভাষা হল জাতির সাধারণ ব্যাপার। বাস্তবতায় এই সাধারণ দিকটার বিদ্যমানতার কারণেই সাধারণ ছাত্র ও সাধারণ মানুষের ভাষা আন্দোলনের সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা ও একুশের আন্দোলনকে তার লক্ষ্যে পরিচালিত ও জয়যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণ সব কিছুকে সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহায়তা ও অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল তার লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, এই হল ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের মহান শিক্ষা।

বইটা প্রকাশের জন্য যে সব বন্ধু ও শ্রদ্ধানুধ্যায়ীরা পরামর্শ, অর্থ, প্রচ্ছদ অংকন, প্রদূষণ ইত্যাদি রূপে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সহায়তার কথা স্বরণ করছি। আর মহান ভাষা আন্দোলনের বিষয়গত দিক হিসাবে স্বরণ করছি এ আন্দোলনের অসংখ্য সংগ্রামী ও শহীদদের। তাঁদের অনেকের নাম কেউ কোনো দিন জানবে না অথচ যে আন্দোলন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সে ইতিহাসের তাঁরাই প্রস্টা। তাঁদের মহান সৃষ্টি হল ভাষা ও একুশের আন্দোলন।

আব্দুল মতিন
১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

ভাষার প্রশ্ন জাতির প্রশ্ন

দীর্ঘ 'দুই শ' বছরের বিদেশী শাসনের পরাধীনতা থেকে মানুষ মুক্তি চাচ্ছিল। সেই স্বাধীনতা তারা পেল ১৯৪৭ সালে। সে স্বাধীনতা তাদের উপহার দিল বৃজোঁয়ারা। স্বাধীনতার প্রশ্নে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি নিজস্ব কর্মসূচীর পরিবর্তে বৃজোঁয়ারদের কর্মসূচীকে সমর্থন করেছিল।

বৃজোঁয়ারদের এক অংশ বলল, সমগ্র উপমহাদেশকে অখণ্ড রেখে তাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা হোক, অপর অংশ বলল, মুসলমানরা উপমহাদেশের যে দুই অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দুই অংশ নিয়ে তাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা হোক। এই নিয়ে বহু বাকবিতণ্ডা, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুন-খারাবী হল। অবশেষে শাসক ইংরেজ, অখণ্ড উপমহাদেশের ভিত্তিতে স্বাধীনতাকামী বৃজোঁয়া দল কংগ্রেস এবং ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশ দ্বিখন্ডিত করে স্বাধীনতাকামী বৃজোঁয়া দল মুসলিম লীগ ঐক্যমতে পেঁছল যে ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশকে বিভক্ত করেই উপমহাদেশটি স্বাধীন হবে। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও এই সিদ্ধান্তে ঐক্যমত পোষণ করল। এইভাবে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। তার পরিনতিতে দুটো রাষ্ট্র হল—একটা, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বৃজোঁয়া রাষ্ট্র ভারত, আর একটা, মুসলিম লীগ নেতৃত্বাধীন বৃজোঁয়া রাষ্ট্র পাকিস্তান।

এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি ছিল, জাতি সত্তা ছিল সেগুলির কথা মোটেই বিবেচিত হল না। ধর্মের ভিত্তিতে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতিগুলিকেও ধর্মের ভিত্তিতেই বিচার করা হল। পাজাবী ও বাঙ্গালী জাতি ধর্ম ও অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত হল। এ ছাড়া অন্য জাতি-গুলি ধর্মের কারণেই হয় ভারত, না হয় পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত থাকল। অন্তর্ভুক্তই কেবল থাকল কিন্তু সে জাতিগুলির কোনো স্বীকৃতি থাকল না। কারণ, প্রধান ব্যাপার, অর্থাৎ রাজনীতিই তখন ধর্ম তথা বৃজোঁয়ারদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা অর্থ তখন বৃজোঁয়ারদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ধর্ম অর্থও বৃজোঁয়ারদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, এবং জাতি অর্থও বৃজোঁয়ারদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মোট কথা, উপমহাদেশের রাজনীতিই তখন বৃজোঁয়ারদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই রাজনীতি এত সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী ছিল যে, এতে জাতির অর্থাৎ জাতি সত্তার কোনো স্থান ছিল না। বলা যায়, ঐ রাজনীতিতে সর্বহারা তথা শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রেণীর স্থান ছিল বৃজোঁয়া শ্রেণীর অধীনে। সেই বৃজোঁয়া শ্রেণীর জন্যই তখন সবকিছু, তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই তখন সব কিছু। সাম্রাজ্যবাদ বৃজোঁয়ারদের রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতিসত্তাগুলি বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্ম বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রেণীগুলি বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীও তাদের রাজনৈতিক দলসহ সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলিও বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এত নিবিড়, নিখুঁত, নির্ভাবনায়, নিরুপদ্রবে সকল ধর্মের, সকল শ্রেণীর ও সকল সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য, সহযোগিতা ও মদতে এ শতাব্দীও এই যুগে আর কোনো বুদ্ধিজীবী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় নাই। এ সব সম্ভব হয়েছিল ধর্মকে বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করার, অর্থাৎ ব্যবহার করতে পারার কারণে।

এর অর্থ কিন্তু কখনো এই নয় যে, শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির কর্তব্য ছিল ধর্মকে বিরোধিতা করা। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির কর্তব্য ছিল বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতা করা, ধর্মকে ব্যবহার করার মতলবকে বিরোধিতা করা, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তদের সাথে তাদের আপোষকে বিরোধিতা করা, কোনো-কোনো ধর্মকে বিচ্ছিন্নভাবে বিরোধিতা করা নয়।

শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা করতে পারে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে, জাতিসত্তাগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার মাধ্যমে। আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি শ্রেণী সংগ্রামও করেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাও করেছে কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় এই দুইটির যে সংযোগ বিন্দু—জাতিসত্তাগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বের অধিকার—তার জন্য তারা সংগ্রাম করে নাই, এমন কি তাদের কর্মসূচীর মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্তও করে নাই।

এ উপমহাদেশে যত ক্ষুদ্র, দুর্বল ও আধ-খোঁচরা হোক যতটুকু পুঁজিবাদ হয়েছে তাতে বাজার ও ভাষাগুলির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে গেছে। এই হল আমাদের দেশে পুঁজিবাদের, সাম্রাজ্যবাদের, জাতিসত্তাগুলির এবং শ্রেণীগুলির বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে, ভিত্তি না করে কোনো বাস্তব ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হতে পারে না।

জাতিগুলির তথা জাতিসত্তাগুলির মধ্যে যেমন বিভিন্ন শ্রেণী আছে তেমনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছে। শ্রেণী ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীগুলি যদি শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হয়, শ্রেণীগুলি যদি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং পাণ্যপাশি বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ জাতিসত্তাগুলির আত্মকর্তৃত্বের জন্য শ্রেণীগুলির কর্মসূচী থাকে তাহলে

জাতিগণ্ডলি ধৰ্মেৰ ভিত্তিতে বিভক্ত হয় না, বুদ্ধজোয়া, সামন্ত ও সাম্ৰাজ্যবাদ ধৰ্মেৰ ভিত্তিতে জনগণকে সহজে বিভক্ত করতে পারে না, একটি দেশেৰ সকল জাতিৰ শ্ৰমিক ও কৃষক শ্ৰেণী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ থাকে, ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্ৰাম করতে পারে, জাতিগণ্ডলিৰ বুদ্ধজোয়া, সামন্ত ও সাম্ৰাজ্যবাদেৰ সমৰ্থকৰা ধৰ্মেৰ নামে জাতিগণ্ডলিৰ মধ্যকাৰ শ্ৰেণী ও জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে পারে না।

বুদ্ধজোয়াৰা ক্ষমতা দখলেৰ প্ৰয়োজন ছাড়া জাতিসত্তা স্বীকাৰ কৰে না, তাৰা ক্ষমতা দখলেৰ উদ্দেশ্য ছাড়া জাতিসত্তাগণ্ডলিৰ বিচ্ছিন্ন হওয়াৰ অধিকাৰ স্বীকাৰ কৰে না। যাৰা ধৰ্মেৰ ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করতে চায় না, যাৰা ধৰ্মেৰ ভিত্তিতে নয় শ্ৰেণীৰ ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান চায়, যাৰা শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ নেতৃত্বে সমাজ পৰিবৰ্তন চায় এবং যাৰা জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে উৎপাদকদেৰ শ্ৰমে সৃষ্ট সকল উৎপাদনেৰ উপায় ও উৎপাদিত মূল্য ব্যক্তিৰ পৰিবৰ্তে সমাজেৰ হাতে ন্যস্ত করতে চায়, সেটাই যাদেৰ শ্ৰেণী স্বাৰ্থ সেই শ্ৰেণী, অৰ্থাৎ সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীই কেবল সকল জাতিৰ বিচ্ছিন্ন হওয়াৰ অধিকাৰসহ পূৰ্ণ আত্মকৰ্তৃত্বেৰ অধিকাৰ স্বীকাৰ করতে ও প্ৰয়োজনে বাস্তবায়িত করতে পারে।

কিন্তু এই উপমহাদেশেৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ পাৰ্টি এই মাক্সবাদী নীতিটি প্ৰকৃতভাবে গ্ৰহণ ও ভিত্তি না কৰাৰ ফলে এ উপমহাদেশেৰ বুদ্ধজোয়াৰা তােদেৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ, তােদেৰ অবাধ ও মুক্ত বিচৰণেৰ সবচেয়ে কঠিন ও জটিল প্ৰতিবন্ধকতা মুক্ত থাকতে পেৰেছিল। তাৰা অতি আগ্ৰাসে ও সহজে ধৰ্মকে তােদেৰ ক্ষমতা দখলেৰ অতি নিৰ্ভৰযোগ্য সোপানে পৰিণত করতে পেৰেছিল।

এই সামগ্ৰিক আৰ্থ-সামাজিক পটভূমিকাৰ বুদ্ধজোয়াৰা উপমহাদেশ ও জাতিগণ্ডলিকে বিভক্ত কৰে, জাতিগণ্ডলিকে বিভ্রান্তি ও অসহায়ত্বেৰ গহবৰে নিক্ষেপ কৰে সাম্ৰাজ্যবাদ ও সামন্ত স্বাৰ্থেৰ সহায়তায় ১৯৪৭ সালে তােদেৰ রাষ্ট্ৰ গঠন করতে সক্ষম হৈছিল।

বিজয় গৰে উল্লসিত, ক্ষমতাৰ মদমত্তে বিভোৰ বিচিত্ৰ এক বুদ্ধজোয়া পাকিস্তান নামক এক অভিনব রাষ্ট্ৰেৰ শাসক হলেৰ। জনগণও স্বাধীনতা লাভ কৰে উল্লসিত, আনন্দিত।

শাসকরা ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম মন্বিত
রাষ্ট্রীয় ডাক, তার, রেল ও মদ্রা বিষয়ক প্রতীকগুলিতে পাকিস্তানের সবচেয়ে
রাজনৈতিক সচেতন, পাকিস্তান অর্জনে প্রধান ভূমিকা সম্পন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ
জনসমষ্টির ভাষাকে স্থান না দিয়ে স্থান দিলেন কেবল উর্দুকে। উর্দুর
সাথে জনগণের কোনো বিরোধ নাই বরং আরবী হরফের জন্য উর্দুর প্রতি
তারা প্রকৃষ্ট। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে এ সবে
কেবল উর্দুকে স্থান দেওয়া (জনগণ) ও বুদ্ধিজীবীরা সঠিকভাবেই উদ্দেশ্য
প্রণোদিত এবং জাতির প্রতি চক্রান্তমূলক কর্মকান্ড বলে সিদ্ধান্তে উপনীত
হলেন।

ঢাকা, খাম, পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম, রেল টিকিট
ইত্যাদিতে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা না দেখতে পেয়ে তাঁর প্রতিবাদ ও
বিক্ষোভে ঢাকা ও বিভিন্ন স্থানের ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও জনগণ ফেটে পড়ল
সভা, মিছিল ও ধর্মঘটে। সেদিন ক্ষমতার মদিরে তন্দ্রাচ্ছন্ন শাসকরা
তাদের অর্ধ মন্বিত চক্ষু সামান্য উন্মোচন করে মদ্রা হাস্য সহকারে সে
দিনের প্রতিবাদের প্রতি কটাক্ষই করেছিলেন। তাঁরা সেদিন উপলব্ধি
করতে পারেন নাই যে, ঐ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে কি হয়ে গেল।
যে জাতিসত্তার বিষয়টিকে বুদ্ধিজীবীরা অবলীলাক্রমে ধূলোয় নিক্ষেপ ও পদ-
দলিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী সে জাতিসত্তাই-যে
সেদিন ভাষার ন্যায্য অধিকারের দাবীতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে
স্বশরীরে তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তা ক্ষমতা আসক্তিতে বিভোর
বুদ্ধিজীবী শাসকরা বুঝতে পারেন নাই। পরে বুঝলেও কোনো উপায় ছিল
না। প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত জাতিসত্তা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা ভাষার দাবী দুই তিন মাসের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালেই
রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পরিণত হয়েছে। বহু মিটিং, মিছিল, নিষাধন ও
কারাবরণের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী ১১ই মার্চ ১৯৪৮ বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার
দাবীতে দিবস হিসাবে পালিত হয়েছে। সমগ্র জাতি মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে
'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' থেকে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' আওয়াজের পিছনে
সমবেত হয়েছে। ছয় মাস আগে মৃত ঘোষিত জাতিসত্তা নিঃশেষ হওয়ার
পরিবর্তে এক মহান আন্দোলনের নেতায় পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর কয়েকমাসের মধ্যে পূঁজিবাদের এমন বিকাশ হয় নি
যে, তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালীরা একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে।

বাঙ্গালীরা তার বেশ আগে থেকেই জাতি হয়ে আছে। ১৭৫৭ সালে কি বাঙ্গালীরা একটা জাতি? না তখনও তারা জাতি তথা একটা পূর্ণাঙ্গ জাতি নয়। এই সময় থেকেই বাঙ্গালীরা প্রকৃত অর্থে জাতি হতে শুরু করেছে। ১৮৫৭ সিপাহী বিপ্লবের সময়ে উপমহাদেশে জাতি গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রতিটি জাতি তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে ঐ সময় দাঁড়িয়ে গেছে।

অথচ তার প্রায় এক শতাব্দী পরও বুর্জোয়া জাতিগুলিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, তাদের কর্মসূচীতে জাতি সমস্যার কথা নাই। বরং ১৯৪০ সালে বুর্জোয়াদের এক অংশ যখন ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের দাবী করেছে তখন সমগ্র বুর্জোয়া যেন তাদের রাষ্ট্র গঠনের একটা চমৎকার ভিত্তি পেয়ে গেল।

১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ সব রকম চেষ্টা করেও সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বকে লোপ করে দিতে বা তার বিজয়কে রোধ করতে পারে নি। সমাজতন্ত্রের শক্তির প্রধান সূত্র সমাজতন্ত্রের নীতি। বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই নীতি বাস্তবতার সব কিছুকে আত্মস্থ করেছে। জাতিসত্তার বাস্তবতাকে অবলম্বন করেই বলশেভিক পার্টি জাতি সত্তার সকল সমস্যা একের পর এক সমাধা করেছে; প্রতিটি জাতিসত্তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ও রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও একটি জাতিও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না বরং তারা আরো বেশী করে সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রকে আকড়ে ধরছে।

আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি জাতিসত্তার বাস্তবতাকে অবলম্বন না করার জন্যই যে বুর্জোয়া ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের দেশে রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছে তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এসে বুর্জোয়া জাতি সমস্যার বেড়া জালে আটকে যায়। বুর্জোয়াদের ধর্মের জাতি ভিত্তিকতার তত্ত্ব এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ইতি মধ্যে ১৯৪৮ সালেই ভাষার প্রশ্নকে ভিত্তি করে বাস্তবে জাতিসত্তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। জাতিসত্তার বিষয়টি বাস্তবের বিষয়ে পরিণত হওয়ায় প্রশ্ন দেখা দিল, রাষ্ট্রের ভিত্তি কি—ধর্ম, না কি জাতিসত্তা? এর ফলে বুর্জোয়াদের ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রের কেবল তত্ত্ব না, তাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত খোদ রাষ্ট্রটাই জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে একটি ভাষার (একটি জাতির ভাষার) রাষ্ট্রভাষা করা না করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

শাসক বুর্জোয়া কি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিতে বাঙ্গালী জাতিসত্তার অস্তিত্বের ভিত্তিতে স্বীকার করবে? বাংলাকে

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে যদি বাঙ্গালী জাতিসত্তাকেই স্বীকার করা হয় তাহলে কেন কিছুদিন আগে জাতিসত্তার বিষয়কে তারা (মুসলিম লীগ) স্বীকার করে নাই এবং তার ভিত্তিতে জনগণের জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের কথা না বলে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সেই রাষ্ট্র মাধ্যমে জনগণের সকল সমস্যার সমাধানের কথা বলেছিলেন? ধর্মই জাতি, মুসলমানরা একটা জাতি এই সব কথা বলে কি মুসলিম লীগ তাদের প্রতারণা করে নাই ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঐ ভ্রান্ত ও অকেজো নীতির জন্য আত্মবিলি দিতে হয় নাই?

এ যে ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, মারাত্মক সমস্যা, একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ব্যাপার! শাসক বুদ্ধিজীবীরা তখনও ব্যাপারটা অত গুরুত্বের মনে করে নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালে বাঙ্গালীদের ভাষার জন্য আন্দোলনকালে তারা কখনো মনে করেছে, এটা হয়তো কিছু, ছাত্রের তামাসা এবং কিছু হিন্দু সংস্কৃতি আচ্ছন্ন লোকের সেই তামাসার হাততালি, কখনো মনে করেছে এ সব কমিউনিস্টদের কারসাজি। তারা তখনও বোঝে নাই যে এটা গুটিকয়েক বালকের তামাসাও না বা মার্কসবাদের জাতি তত্ত্বভিত্তিক কর্ম-কান্ডও না। কমিউনিস্টরা তখনও জাতিসত্তার নীতি বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে উপলব্ধি করে নাই।

তখন শাসকরা মনে করলেন পাকিস্তানের শ্রুতি, তাদের মধ্যকার জনগণের সবচেয়ে আস্থাভাজন, সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'কায়েদে আজম' মোহাম্মদ আলি জিন্নাহকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠালে এবং তিনি বললেই বাঙ্গালীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়টা মেনে নেবে এবং সমস্যার সমাধান হবে।

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রবল প্রতাপশালী নেতা সেই 'কায়েদে আজম' ঢাকার আসলেন, যা বলার বললেন কিন্তু তিনি বিজয়ী হয়ে ফিরে যেতে পারলেন না। তাঁর কেবলমাত্র 'উদ্বুদ্ধ হব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নসিহংটা জনগণও গ্রহণ করতে পারলেন না, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা তো আরো না। তার ২১শে মার্চ রেসকোর্সের বক্তৃতা মাঠেই মারা গেল, আর ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে সভার বক্তব্য প্রতিরোধের সম্মুখ সমরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিশ্চূপ হয়ে গেল।

এরপর তিনি ভাষা আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের বোঝাবার প্রয়াসেও একই পরিণতি বরণ করলেন। বরং ছাত্র নেতারা তাঁর মত একচ্ছত্র নেতার মূখের ওপরই অনেক কথা শুনিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে কথাও বললেন। নেতারা যে অযোগ্য, অথর্ব ও গণবিচ্ছিন্ন তা নিজেরা জানলেও নেতার কাছে বিপরীতটা প্রমাণ করার প্রয়াসে তাঁরা বরং তিরস্কৃতই হলেন। নেতা তাদের বলে গেলেন তাদের কি করতে হবে। নেতার কথায় এখানকার মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে কিছুটা ঐক্য সঞ্চারিত হলেও তা ভাঙ্গা ঘরে প্যালার অতিরিক্ত কিছু হতে পারল না। ১৯৪৭-৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও প্রভাবে দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিল।

বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকে। ডাক টিকিট, মনি অর্ডার ফর্ম, টাকা ইত্যাদিতে কেবল উর্দু থাকায় ঢাকার ছাত্রজনতা সভা, মিছিল ইত্যাদি মাধ্যমে-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং উর্দুর পাশে বাংলার দাবী জানান।

ডিসেম্বর মাসে করাচীতে শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানের বাধ্যতামূলক ভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে ছাত্ররা বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সেক্রেটারিয়েট ভবনে উপস্থিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সে সময় সচিবালয়ে উপস্থিত না থাকায় শোভাযাত্রীরা তার বাস ভবনে গিয়ে তার সাথে কথা বলে। “..... বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পর তিনি একটা কাগজে লিখিতভাবে আশ্বাস দেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করবেন। খাজা নাজিম উদ্দিনের বাস ভবন থেকে মিছিলটি মনিং নিউজের ঢাকা অফিসে গিয়ে কাগজের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাত করে ভাষা সম্পর্কে তাদের নীতি পরিহার করার দাবী জানান।” (পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি—১ম খণ্ড, পৃঃ ২২, বদরুদ্দীন উমর)

“ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ তাদের উদ্যোগেই গঠিত হয়।” (ঐ, পৃঃ ৪৬)।

এরপর ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের যে প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সেখানে ভাষার প্রশ্ন আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকেও অন্যতম ভাষা, তথা রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

“ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী
লিয়াকত আলি খান বলেন :

এখানে এ প্রশ্নটা তোলাই ভুল হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটি
জীবন-মরণ সমস্যা। (শাসকদের অকপট স্বীকৃতি—আঃ মতিন)।
আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং
আশা করি এ ধরনের একটি প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন। (ঐ,
পৃঃ ৫০) - খাজা নাজিমউদ্দিন ছাড়া গণ-পরিষদের সভাপতি তমিজ
উদ্দিন খানও ভাষা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে
বক্তৃতা করেন। (ঐ, পৃঃ ৫২)

বাংলা ভাষাকে গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবী অগ্রাহ্য হওয়ার
সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হওয়ামাত্র ছাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তীব্র
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উদ্যুকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রভাষা
করার পক্ষপাতি, খাজা নাজিম উদ্দিনের এই উক্তি কে তাঁরা সকলে সম্পূর্ণ
ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেন। তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করতে
থাকেন যে, পাকিস্তান মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালী সদস্যরা কোন হিসাবে
বাংলা ভাষাকে পরিষদের অন্যতম ভাষা করার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন ?

গণ-পরিষদের বাংলা ভাষা বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৬ শে ফেব্রু-
য়ারী (১৯৪৮—আঃ মতিন) ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় ধর্মঘট পালন করেন।
ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং
স্কুলের ছাত্রেরা ক্লাস বর্জনের পর একটি মিছিল করে বাংলা ভাষার সমর্থনে
নানা প্রকার শ্লেসাগান দিতে দিতে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হওয়ার পর বিকেলের দিকে সেখানে
একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায়.....‘পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদ দিবস’
পালন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা বিরোধী
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গঠন করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান
মুসলিম ছাত্র লীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং তমিজউদ্দিন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে
২রা মার্চ, ১৯৪৮ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও কর্মীদের একটা সভা
আহ্বান করা হয়।.....

...এই সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। ...সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসাবে মনোনীত হন সামসুল আলম।

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সভায় পাকিস্তান গণ-পরিষদের সরকারী ভাষার তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ হিসাবে ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। (ঐ, পৃঃ ৫৯-৬১)।

১০ই মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি সভা বসে। সভায় ধর্মঘটের বিস্তারিত কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই আলোচনা কালে সামসুল হক (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক—আঃ মতিন) ১৪৪ ধারা জারি হলে তা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু অলি আহাদ, আবদুল ওদুদ প্রভৃতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে মত দেন। এ সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়নি। সরকার কতর্ক শহরে ১৪৪ ধারা জারি না করার ফলে এ সিদ্ধান্তের (সিদ্ধান্তহীনতার—আঃ মতিন) গুরুত্ব ও খুব বেশী ছিল না। (ঐ, পৃঃ ৬৬)

১১ই মার্চের ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গ সরকারের একটি প্রেস নোট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় :

বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর করবার জন্য আজ ঢাকাতে কিছু সংখ্যক অন্তর্গতিক এবং একদল ছাত্র ধর্মঘট করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু দোকান পাট বন্ধ থাকে। শহরের এবং আদালতের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল।

রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু অফিসের লোকদেরকে কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দল সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট এবং অন্য কতকগুলি অফিসের দক্ষদুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যরা আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানে

অবাস্থিত পদুলিশ ও অফিসে যোগদানে ইচ্ছুক কিছ, সংখ্যক লোকজনদের উপর ইটপাটকেল ছোড়ে এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। এর ফলে পদুলিশ লাঠি চার্জ করতে বাধ্য হয় এবং ৬৫ জনকে গেকতার করে। এ সময় দুবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিকোভ প্রদর্শন ও পদুলিশ তৎপরতার ফলে মোট চৌদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে বা গুলির আঘাতে আহত হন নাই। খানা তল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

এ প্রসঙ্গে সাতাহিক 'নও বেলালের' ঢাকাস্থ প্রতিনিধি প্রেরিত একটি চিঠিতে বলা হয় :

১১ই মার্চের এতবড় ঘটনার পর পূর্ব-বঙ্গ সরকার যে প্রেস নোট বাহির করেন তাহা পড়িলেই বুঝা যায় প্রকৃত সংবাদকে র‍্যাক আউট করার জন্য সরকার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রেসনোটে বলা হয় মাত্র কতিপয় বিভেদ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের দুঃমন এই ধর্মঘটে বোগ দিয়াছিল। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অর্থাৎ সরকারের মতে মর্দুটিমের কমুনিষ্ট এবং কতিপয় হিন্দু ধর্মঘটে অংশ নিয়াছিল। অথচ কে না জানে ধর্মঘটকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ঢাকার প্রত্যেকটি মুসলমান ছাত্র পদুলিশের গুলি, ব্যাগনেট ও লাঠির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। অথচ সরকারের মতে মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। প্রচারণার কি অপূর্ব নমুনা। (এ, পৃঃ ৭২-৭৩)

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কনভেনার নঈমউদ্দিন আহমেদ ১১ই মার্চ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতির মাধ্যমে ১১ তারিখের সরকারী জব্দনের প্রতিবাদ করেন।.....

তার এই বিবৃতিতে ১১ই মার্চের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে আহত ও পদুলিশ কতক ধৃত ছাত্রদের একটা হিসাবও দেওয়া হয়। সেই হিসাব মতো আহতের সংখ্যা—২০০; গুরুতরভাবে আহত—১৮; ধৃত—৯০০ (এদের মধ্যে অনেককে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়) এবং জেলবন্দী—৬৯। (এ, পৃঃ ৭৫)

১১ই মার্চ কেবল ঢাকায় নয় সিলেট, যশোর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাবনা, রাজশাহী সহ দেশের প্রায় সর্বত্র একই ভাবে পালিত হয়। সব জায়গায় অংশ গ্রহণকারীদের একই রকম জেন, জুলুম ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়।

পরবর্তীতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' গুলিতে ১৩ মার্চ পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়।.....

১৪ই মার্চ তারিখেও পূর্ব বাংলার সর্বত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি শহরে ছাত্রেরা বিপুল উদ্‌যাপনের সাথে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। (ঐ পৃ: ৭৬)

এরপরও কিছুদিন আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আন্দোলনের নেতৃত্ব এই সময় আন্দোলনকে পরিষদভবন অভিমুখী করে তোলেন। ঐ সময় পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার মার্চ মাসের অধিবেশন চলছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রায় সকলেই পাকিস্তান আন্দোলনেরও উল্লেখযোগ্য ছাত্র নেতা ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে ঐ সব ছাত্র নেতাদের এবং সাধারণভাবে ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই হিসাবে ঐ সময়কার ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রায় সকলেরই পরিষদের সরকারী ও বিরোধী এবং মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপগুলির সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, এমন কি কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক সম্পর্কও ছিল। তাঁরা অবলীলাক্রমে যেমন মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, প্রভাবশালী সরকার দলীয় সদস্য, তেমনি বিরোধী দলীয় এবং মুসলিম লীগের গ্রুপগুলির নেতাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও সলা পরামর্শ করতে ও সরকারের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির খোজ খবর নিতে পারতেন। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব পরিষদ ভবন ঘেরাও করার কৌশল আশ্রয় করেছিলেন। সরকার ও মুসলিম লীগ কেন্দ্রের নীতি ও নির্দেশে পরিচালিত হলেও ভাষা আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন ও আন্দোলনের বিকাশে এখানকার সরকার সমস্যায় জর্জরিত অবস্থায় দিশাহারা এবং ভীত সন্ত্রস্ত তারচেয়েও বেশী।

তবু, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব আন্দোলনকে আর এগিয়ে নিতে পারছিলেন না। এর কারণ, নেতৃত্বের কাছে আন্দোলনের দিশা ছিল না। তাদের কাছে ভাষার বিষয়টা কোনো বিশেষ আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত থাকার এবং নেতৃত্বও

ধাকার কারণে তারা ভাষার সমস্যাকে জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। আসলে ভাষা জাতির বিষয়, জাতি সত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। ভাষাকে এভাবে না দেখলে ভাষার জন্য আন্দোলনকে কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে বা লক্ষ্যের প্রয়োজনে এগিয়ে নেওয়া যায় না।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব এই কারণে ভাষা আন্দোলনকে একটা পর্যায়ের পর এগিয়ে নেওয়ার পথ পান নি। তাদের উচিত ছিল সাধারণ ছাত্রদের ওপর ভিত্তি ও নির্ভর করে ভাষার আন্দোলন জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ আন্দোলন এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে আন্দোলন জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে। তাহলে জনগণ ভাষার দাবীকে সমর্থন করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য শাসকদের বাধ্য করতে পারত। নেতৃত্ব ছাড়া জনগণ কিছু করতে পারে না।

আসলে সেই সময় ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব আদর্শগতভাবে আন্দোলন সম্পর্কে লক্ষ্যসম্পন্ন ছিলেন না। নেতৃত্বের উপলব্ধি ছিল না যে ভাষা জাতি-সত্তার ব্যাপার। তারাও মনে করতেন ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র হতে পারে বা হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক আকাংক্ষা ও বোধ থেকে তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তুলেছিলেন এবং সে আন্দোলনের নেতৃত্ব হয়েছিলেন। এই হিসাবে তারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের সাথে জাতিসত্তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বের অধিকার সম্পর্কিত আদর্শগত প্রশ্ন এদের মৌলিক তফাৎ ছিল না।

অন্যদিকে, দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি থাকলেও তারাও ভাষাকে পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে জাতিসত্তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বের বিষয় হিসাবে দেখেন নাই। তাদের ক্ষেত্রেও জাতিসত্তার প্রশ্ন অতীতের জের কিছু কম ছিল না। অতীতে তারা জাতিসত্তা দেখলেও শ্রেণী সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতার সাথে জাতিসত্তার বিদ্যমানতার বাস্তবতাকে বহুবাদী দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পর্কিত করেন নাই।

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ায় তার পরিণতিতে এদেশের গোটা একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় সামাজিকভাবে নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সামাজিকভাবে মূলতঃ এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায়, সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপকহারে দেশ ত্যাগ করা, পার্টিরও বড় একটা অংশ দেশ ত্যাগ করা, এদেশের মানুষের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা দেখতে না পারা এবং পার্টির হঠকারী রণকৌশলের কারণে জনগণ

থেকে আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পার্টি' নেতৃত্ব এত হতচাকিত, কক্ষচ্যুত ও বিড়ম্বিত হয়েছিলেন যে নতুন ও অভিনব একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে, বা সাধারণভাবেও জাতি বিষয়ক জটিল বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টার পরিবর্তে ভাষা সম্পর্কিত আন্দোলনে প্রচলিত গণতান্ত্রিক বোধ ও প্রক্রিয়ায় সামিল থাকা সেই সময়কার কতব্য বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং ভাষা আন্দোলন সবদিক থেকে সেই নেতৃত্ব থেকে বর্ণিত ছিল যে নেতৃত্ব ঐ আন্দোলনকে জাতিসত্তার বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করে দেখতে ও সম্পর্কিত রাখতে পারে।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব কয়েকদিন পরিস্ফুট ভবন ও মন্ত্রীদের মাঝে-মধ্যে ঘেরাও করে রেখে, তাদের ওপর চাপ সৃষ্টির সবপ্রকার কৌশল খাটিয়ে বিভিন্ন গ্রুপকে ভাষার দাবীতে সক্রিয় করেও আন্দোলনকে আর ধরে রাখতে বা তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে জয়যুক্ত করতে পারলেন না।

ভাষা আন্দোলনের মত একটা আন্দোলনের জয় বলতে আমরা কি বুঝব? নির্দিষ্টভাবে পাকিস্তানের অবস্থায় ভাষা আন্দোলন হল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে সরকারকে বাধ্য করার আন্দোলন। এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলন দ্বারা অর্থাৎ এই আন্দোলনের বিজয় দ্বারা জাতিসত্তার পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন হয় না। তার পূর্বশর্ত মাত্র সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের অবস্থায় যেখানে শাসকশ্রেণী ধর্মকে জাতি বুঝিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায়, কংগ্রেসের মত, প্রতিবাদে ও কমিউনিস্ট পার্টির নীরবতার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, যেখানে শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসংখ্যার ও পূর্ণগঠিত একটি জাতির এবং যে জাতি আবার একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী ও তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা কেবল রাষ্ট্রশক্তির জোরে না দিতে প্রয়াসী সেখানে সেই জাতির তাদের ভাবার রাষ্ট্রভাষার জন্য অবিরাম সংগ্রাম সেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য ন্যায়সঙ্গত প্রস্তুতিপর্ব। এই সংগ্রাম তথা ভাষার রাষ্ট্রভাষার জন্য এই সংগ্রাম যেন একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তেমনি এই সংগ্রাম একটি জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামেরও পূর্বশর্ত। রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রামকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিতভাবে না দেখলে সে সংগ্রাম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবেও বিজয়ী হতে পারে না।

জাতিসত্তার পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সেই জাতির বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শাসকশ্রেণীসহ সবজন স্বীকৃত

বাস্তবতা। স্মৃতরাং ভাষার জন্য সংগ্রামের বিজয় হল শাসক শ্রেণী কর্তৃক সেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারেরও স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি শাসকশ্রেণী ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকার না করলেও বাস্তবের কোনো হেরফের হয় না। বাস্তব ইচ্ছা নিরপেক্ষ। আন্দোলনের ফলে অবস্থা কি দাঁড়ায় তার ওপরই নির্ভর করে সব কিছুর। অবস্থা সে রকম হলে শাসকরা আজ হোক কাল হোক তাকে স্বীকার করতে বাধ্য। স্মৃতরাং জাতির ভাষার জন্য তথা রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রামের অবস্থাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষিত হতে হবে এমন আন্দোলনে যা রূপে যাই হোক প্রকৃতিতে হবে দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের মত, যে অভ্যুত্থানের শক্তির কাছে পাকিস্তানের অবস্থায় শাসক শ্রেণী হবে পরাধীন, ভুলদৃষ্টিত ও মর্ষাদালমুগ্ধ, যে অবস্থায় শাসকশ্রেণীর জন্য সেই জাতির ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ ডেকে আনবে শাসকশ্রেণীর তথা তাদের রাষ্ট্রের অবলুপ্তি অর্থাৎ সেই সংগ্রামের জাতির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়।

✓ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব আন্দোলনকে এই পর্যায় নিয়ে যেতে পারে নি। এই কারণে আন্দোলনও জয়যুক্ত হয় নাই। তবে ১৯৪৮ সালের আন্দোলনের ব্যর্থতাই পরবর্তীতে ভাষার আন্দোলনকে জয়যুক্ত হতে সহায়তা করেছিল, প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল।

✓ আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা না গ্রহণ করার কারণে এবং আন্দোলনের দিশা নির্ধারণ করতে না পারার কারণে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পূর্বতন নেতৃত্ব নতুন উদ্যমে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে তথা আন্দোলন শুরুর করতে উদ্যোগী হন নাই বা হতে পারেন নাই।

ভাষার আন্দোলন যেহেতু জাতিসত্তার সাথে সম্পর্কিত আন্দোলন, জাতি যেহেতু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে পেতে চায় এবং তার জন্য সংগ্রামও করতে চায়, প্রয়োজন যেহেতু কেবল দিশা সম্পন্ন নেতৃত্বের সেইহেতু ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাবেশে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় দিশাসম্পন্ন নেতৃত্বের উত্তর ঘটল তখন থেকে ভাষা আন্দোলনের যাত্রা নতুন করে শুরুর হল।

ভাষা আন্দোলনের ওপর সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা জনাব বদরুদ্দিন উমর তার 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' বইর তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন, '১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।' সালটা ১৯৫০, ১৯৫১ নয়। সাল সম্পর্কে এই ভুল

সত্ত্বেও তিনিই একমাত্র লেখক যিনি ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অসাধারণ গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং ঐ কমিটি সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর থেকে। যে আন্দোলন আমাদের দেশের ও পাকিস্তানের রাজনীতির মোড় আমূল পরিবর্তন করে দেয়, যে আন্দোলন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিকল এবং শাসক শ্রেণীকে ঠুঁটো জগন্মাথে পরিণত করে দেয়, একটি পশ্চাদপদ জনসমষ্টিতে স্থায়ীভাবে রাজনীতির নিষ্কারক শক্তিতে পরিণত করে দেয় সেই আন্দোলনকে বদ্ব্যপ্ত হলে সে আন্দোলনের সংগঠন ও তার পরিচালকদের চিন্তাভাবনা জানতে ও বদ্ব্যপ্ত হবে। এই সংগঠন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি।

এই কমিটি আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক ভূমিকা পালনকারী আর দশটা কমিটির মত না। এই কমিটি নির্দিষ্ট রাজনীতির ধারক-বাহক ছাত্র সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই কমিটিতে তাদের বিশেষ ভূমিকা নেই। এই কমিটি সমগ্র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যে ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী তার মতাদর্শগত উদ্যোক্তা, নির্মাতা, পরিচালক ও সংগঠক। অথচ এই কমিটির সংগঠকদের সম্পর্কে বদ্ব্যপ্ত উম্মর বা দু একজন লেখক ছাড়া কারও লেখাতে এ স্বীকৃতি, মূল্যায়ন, আলোচনা দূরের কথা তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের ওপর কম লেখা-জোখা হয় নি। তাঁদের অধিকাংশের লেখা পড়ে মনে হয় না ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের উদ্যোক্তা, সংগঠক, নির্মাতা ও নেতা কেউ ছিলেন। এত বড় ও মহান আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এভাবে অস্পষ্ট, কুশাশ্রয় ও বিমূর্ত রাখার ফলে কি আমরা লাভবান হয়েছি? এইসব লেখকদের প্রায় সকলেই রাজনীতি, প্রশাসন, সাহিত্য, শিল্প, আইন, সাংবাদিকতা ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠা, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরাই লিখেছেন, তাঁরাই বলছেন। তাদের কথাবার্তা শুনে, তাদের লেখা পড়ে মনে হয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নেই, সে আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হয় নাই, তা যেন আপনা-আপনি হয়ে গেছে, এ আন্দোলন যেন অর্থনৈতি, রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার না, এ যেন ছিল অবধারিত স্বতঃস্ফূর্ত একটা ঘটনা। প্রাণ দেওয়া ছাড়াও এর জন্য অনেকে কমিটি, সংগ্রাম পরিষদ ইত্যাদি সংগঠিত করেছেন, কারাবরণ করেছেন, আত্মগোপনে থেকেছেন। এ আর এমন কি! এ সব ছাড়াই যেন এত বড়, এত দীর্ঘস্থায়ী, এমন সফল ও মহান

আন্দোলন হয়ে যায়। অবশ্যই তা অনেক কিছু—আমাদের অমূল্য সম্পদ গর্বের ও ইতিহাসের বিষয়। ২১শে হঠাৎ করে হয় নি। ২১শের আগেও বাস্তব ছিল, সচেতন প্রচেষ্টায় সে বাস্তব কি ভাবে ক্রমে ২১শের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তাও ইতিহাসেরই বিষয়।

১৯৪৮ এর ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে মর্মবস্তুরে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। ১৯৪৮ এর ১১ই মার্চের পর ভাষা আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। শাসকরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী মেনে নেয় নি, ১১ই মার্চের পর ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য কার্যতঃ কোন কমিটি নেই, কোন মিটিং নেই, মিছিল নেই। যেন বাংলা ভাষার, বাঙ্গালীদের ভাষার কোন সমস্যা নেই, যেন বাংলার রাষ্ট্রভাষার তথা রাষ্ট্রভাষা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এই রকম অবস্থা চলেছিল ১১ই মার্চের পর সমগ্র ১৯৪৮ সাল ব্যাপী, সমগ্র ১৯৪৯ সাল ব্যাপী এবং ১৯৫০ এর মার্চ পর্যন্ত। যে শাসকরা ১৯৪৭ সালের শেষ ও ১৯৪৮ সালের প্রথম দিককার দীর্ঘ চার-পাঁচ মাস ব্যাপী তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়া ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতা ও আপোষহীনতায় তাদের পূর্ব পাকিস্তানে শাসনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহান হয়ে পড়েছিল, আন্দোলনের স্থায়িত্ব ও বিকাশের আশঙ্কায় সদা সন্ত্রস্ত ছিল ১৯৪৮ এর মার্চের পর সেই 'ভয়াবহ' আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে শঙ্কুচিহ্নিত ও স্তিমিত হতে এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী নীরব নিস্তরঙ্গ ও নিস্তব্ধ থাকতে দেখে তাদের মনে আশার সঞ্চার ও ধারণা হতে শুরু করেছিল যে বাংলা ভাষার জন্য পূর্ব বাংলার আর আন্দোলন হয়তো হবে না, বাংলার দাবী হয়তো প্রকৃতই ছিল কিছু সংখ্যক ছাত্রের উচ্ছ্বাস বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত মহল বিশেষের প্রচেষ্টা মাত্র।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের শুদ্ধ-প্রায়, অস্বস্তিকর ও হতাশাজনক পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন বেতন ভোগী কর্মচারীদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে দুই মাস কারাবাস শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অপমানজনক মনুচলেকা মানতে অস্বীকৃতির ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত অবস্থায় ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে পুনরাতন ষাদ্দুঘরের সম্মুখস্থ মসজিদ সংলগ্ন রেষ্টুরেন্টে একদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় পাশের টেবিলে কয়েকজন লোক, সম্ভবতঃ পার্শ্ববর্তী ব্যারাক গুলির সেক্রেটারিয়েট কর্মচারী, চা খেতে খেতে যে কথাবার্তা বলছিলেন তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁদের একজন বলছিলেন,

বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে তো বাঙ্গালীদের কোন ভবিষ্যত থাকবে না, তারা উর্দু ও পশ্চিমাদের জুলুম এবং শাসনে শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র ভরসা ছাত্ররা, তারাও তো আর বাংলার জন্য কিছ, করছে না। ছাত্ররা কিছ, না করলে বাংলার কোনো কিছ, হওয়ার আশাই করা যায় না। তাঁর সঙ্গে লোকেরা তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, ছাত্ররা এভাবে থেমে গেল কেন? তারা আবার শুর, করলেই তো তাদের সমর্থন করে বাংলা ভাষার জন্য তারাও দাঁড়াতে পারে, বাংলার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হতে পারে.....।

তাদের কথাবার্তা শুনে আমার যেন চোখ খুলে গেল, আমার কাছে সমস্ত কিছ, দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল, ভাষা ও জাতি সম্পর্কিত নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল, আমি করণীয় পেয়ে গেলাম। তাদের কথা-গুণির তাৎপর্য উপলব্ধি করে আমি যেন ভিন্ন মানদুখে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম।

এর কয়েকদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ছাত্র সভায় আমি কিছ, বলার অনুমতি চাইলাম। ইতিপূর্বে ছাত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমার কিছ, ভূমিকা থাকলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। আমি ছাত্র সংগঠনের নেতৃস্থানীয় কিছ, ছিলাম না। তব, আমি কিছ, বলার তাগিদ অনুভব করছিলাম। এর কারণ, উল্লেখিত রেস্টুরেন্টে কয়েকদিন আগে আমার শোনা উপরোক্ত কথাবার্তা।

অনুমতি পেয়ে ছাত্র সভায় আমি বললাম, প্রতি বছর আমরা ১১ই মার্চ উদ্‌যাপন করছি। এটা একটা গতানুগতিকতা, কেবল এ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে না। সকল মানুষ, সমগ্র জাতি তাদের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে চায়। তারা এর জন্য ভরসা করছে ছাত্রদের ওপর। ছাত্ররাই এ আন্দোলনের স্বাভাবিক ও প্রাথমিক নেতৃত্ব। প্রশ্ন হল, ছাত্ররা তাদের এ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে কি না। ছাত্ররা এ আন্দোলন শুর, করলে আপামর জনগণ তাদের ভাষার জন্য এ আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করবে এবং সেই কারণে তা অতি অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।

করণীয় হিসেবে বললাম, এর জন্য সর্বপ্রথম ছাত্রদের দলমত নির্বিশেষে এক্যবদ্ধ হতে হবে, তারপর আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে।

এই কথাগুলি বলার পর পরই কমিউনিস্ট পার্টির নাদেরা বেগম সভাপতির মাধ্যমে আমাকে প্রশ্ন করলেন, সে কাজটা কিভাবে করতে হবে তা যেন আমি ব্যাখ্যা করি।

তার উত্তরে আর্থি বললাম, দলমত নির্বিশেষে যারাই বাংলার দাবীকে সমর্থন করেন সেই রকম সকল সংগঠনের দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি জাতীয় ছাত্রদের একটা কেন্দ্রীয় সংগঠন করতে হবে। সেই কমিটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে দেশ-ব্যাপী প্রচার অভিযান চালাবে এবং ছাত্রদের সংগঠিত করবে। তারপর সংগঠিত ছাত্ররা বাংলা ভাষার আন্দোলনে জনগণকে সামিল করবে। এই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রদের সংগঠিত করা সম্ভব হবে এবং পরবর্তীতে এরই ভিত্তিতে দেশব্যাপী ছাত্র জনতার আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে।

আমার এই বক্তব্য সেই সময়কার অবস্থার সঙ্গে এবং সাধারণ ছাত্রদের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার সাথে এত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে, তারা তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন এবং সেখানেই প্রতিটি ছাত্র সংগঠন ও একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হল। কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচনের প্রশ্নে ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের থেকে দু-একজন সদস্য নির্বাচনের প্রশ্নটি পরবর্তী কমিটি বৈঠকে নির্ধারণের প্রস্তাব দিলে সাধারণ ছাত্ররা সে প্রচলিত পদ্ধতির প্রস্তাব নাকচ করে সাধারণ ছাত্র সভাতেই আহ্বায়ক নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে আহ্বায়ক নির্বাচন করলেন।

এই ভাবে ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই সময় আমাদের দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। জনাব বদরুদ্দীন ওমর তাঁর প্রখ্যাত “পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” বইতে বলেছেন, ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপনী সভাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের পর থেকে ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। মার্চ পরবর্তী ১৯৪৮ এবং সমগ্র ১৯৪৯ সালে আর ভাষার প্রশ্নে কোনো আন্দোলন হয় নাই। এতেই প্রমাণ হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে যারা ভাষার জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যে আন্দোলন একটা শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিল তারা ভাষার প্রশ্নটিকে সামগ্রিকভাবে জাতি সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করে উপলব্ধি করেন নি এবং সেই

কারণে তারা ভাষা আন্দোলনকে তথা বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি প্রাপ্তির অবস্থায় বা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন নি।

কিন্তু যেহেতু ভাষা জাতিসত্তার মূল উপাদান, যেহেতু পাকিস্তানে বাঙ্গালীরা প্রধান জাতিসত্তা, যেহেতু শাসকরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করে বাঙ্গালী জাতিসত্তাকে অস্বীকার করেছিল সেইহেতু আন্দোলনের নেতৃত্ব ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে অপরাগ হলেও এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে বিরত হলেও মানুষের মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছা, আকাংখা ও প্রয়োজনীয়তা বোধ পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রস্তাবকরা ভাষা আন্দোলন ও জাতিসত্তার মধ্যকার এই সম্পর্ক ও জনগণের বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাওয়ার ইচ্ছা আকাংখার বাস্তবতা উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণে, তাদের সংগঠন ও আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাব সাধারণ ছাত্ররা উৎসাহের সঙ্গে সবিস্তরকরণে সমর্থন করেছিলেন এবং সেই সমর্থনের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি ভাষা আন্দোলনকে ধাপে ধাপে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে নিতে পেরেছিল।

কমিটি গঠনের অল্পদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি জনগণের মধ্যে একটা প্রতীকের ভিত্তিতে প্রচার ও আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পতাকা দিবসের আহ্বান জানায়। ভাষা আন্দোলনের জন্য জনগণের কাছে অর্থের আহ্বানও এই প্রথম। জনগণ পতাকা দিবসের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা দেখে যেমন আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন তেমনি আন্তরিকভাবে আর্থিক সহায়তাও করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি দেশব্যাপী পতাকা দিবসের আহ্বান জানায় নাই। ঢাকা শহরেও পরিষ্কার মূলকভাবে কেবল সেক্রেটারিয়েট ভবন এলাকায় পতাকা বিক্রয় করা হয়েছিল। চার আনা, আট খানা করে প্রায় হাজার খানেক টাকা সেদিন সংগৃহীত হয়ে ছিল।

পতাকা দিবস সম্পর্কে বদরুদ্দীন ওমর ছাড়া কোনো লেখক কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ১৯৫০ সালের এপ্রিল বা মে মাসের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে পতাকা দিবস পালিত হয়েছিল, তবে ওমর সাহের তাঁর বইতে যে সন ও তারিখে এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ দিবস পালিত হয়েছিল বলেছেন, সেটা ঠিক না। তিনি তাঁর 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন

‘তৎকালীন রাজনীতি’ বইর তৃতীয় খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, ‘নব গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের প্রথম বৈঠক হয় ১৩ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখে।.....এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভাষা আন্দোলনের তহবিল সংগ্রহের জন্য পতাকা দিবস পালন করা হবে।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি প্রতিষ্ঠার তারিখ ১১ই মার্চ হলেও সাল ১৯৫০। ওমর সাহেব বলেছেন, ১৯৫১। ভুলটা প্রধানত যারা বদরুদ্দীন সাহেবকে সালটা বলেছেন, তাঁদের। যারা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন, ১৯৫১-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন বা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাদেরও অনেকে আমাকে বলেছেন, সালটা ছিল ১৯৫১। আমি নিজেও সালটা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ছিলাম। বছর দুই আগে আমার ঐ সময়কার বাঁশের তালার ছাউনির ইকবাল হলের রুমমেট ও বর্তমানের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনের পরিচালক জনাব আমানুজ্জামান খান আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির “স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি করুন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন” শীর্ষক একটা প্রচারপত্র দেন। আমি প্রচারপত্রটা ওমর সাহেবকে দেই। সেটা তাঁর বইর তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্টব্য। তারও বছর দুই আগে ‘ফসল’ কাগজের সম্পাদক জনাব এরশাদ মজুমদার আমাকে বলেন, ১৯৫১ সালেই আপনার স্বাক্ষরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির স্মারকলিপিতে আপনারা পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ বলেছিলেন। আমার ঐ দলিলটি দেখার দারুণ আগ্রহ হয়। কারণ, ১৯৫৯ এর পর আমি ঐ দলিলটি দেখি নাই। তিনিই বোধ হয় আমাকে স্মারকলিপির একটা ফটোস্ট্যাট কপি দিয়েছিলেন। সেটাও আমি ওমর সাহেবকে জানাই। তিনি জানান, তিনি ঐ স্মারকলিপির একটা কপি সংগ্রহ করেছেন। এটাও ওমর সাহেবের উপরোক্ত বইর তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্টব্য। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির “বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালন করুন” শীর্ষক তারিখ বিহীন একটা প্রচারপত্র আছে। ওমর সাহেবের উপরোক্ত বইর ৯ম খণ্ডে দৃষ্টব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির এই তিনটি দলিল বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় ঐ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ, ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ নয়। ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ কমিটি ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানাতে পারে না। ১১ই মার্চ ধর্মঘট

পালনের উপরোক্ত প্রচারপত্রে তারিখ না থাকলেও তাতে বলা আছে 'তিন বৎসর পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ আমরা ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করি।' সুতরাং প্রচারপত্রটির রচনা কাল ১৯৫১ সাল। প্রচার পত্রটির রচনাকাল ১৯৫১ সাল হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলেছিল ১১ই মার্চ ১৯৫০ সালে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পতাকা দিবস সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গনক কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে। বিষয়টা হয়তো আমি ওমর সাহেবকে বলেছিলাম। তিনি হয়তো ঐ বিষয়টা তাঁর তথ্যবহুল বইতে উল্লেখ করা প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করেন নাই। আজ ভাষা আন্দোলন ও ২১শে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ইতিহাস সম্মতভাবে কথা বলছেন না এবং ভাষা আন্দোলনে তাদের ভূমিকাকে বেশী করে বলছেন। এ রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক না। একে তো ভাষা আন্দোলন ৩৬/৩৭ বছর পূর্বের ব্যাপার হয়ে গেছে, তা ছাড়া এতদিন পরে আমরা অনেকেই আন্দোলনে নিজের বা দলের বা গোষ্ঠির ভূমিকাকে কিছ, বেশী করে দেখতে পারি বা এতদীর্ঘ দিন পর সে ভূমিকা আমাদের বর্তমান চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষিতে অন্য রকম মনে হতে পারে। তবে, ইতিহাসকে বহুনিষ্ঠ করার প্রচেষ্টার আবশ্যিকতা ইতিহাসেরই শিক্ষা। ইতিহাসকে বহুনিষ্ঠ করতে হলে ধারনার চেয়ে বাস্তবকে প্রধান করা বাঞ্ছনীয়। ওমর সাহেবের ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত বইটি যথেষ্ট বহুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম আছে তা উল্লেখ করার প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পতাকা দিবস সম্পর্কে কথাগুলি বলছি।

১৯৫০ সালের এপ্রিল বা মে মাসের দিকে পতাকা দিবস পালিত হয়েছিল। যে কারণেই হোক প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রায় সদস্যই কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন না। আগেই বলেছি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল দলীয়, অর্থাৎ ছাত্র সংগঠনগুলির সমসংখ্যক প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আহূত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমাবেশে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ছাত্রদের এবং তাদের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলাম। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয়

কমিটি তথা ঐ ছাত্র সংগঠন থেকে বহিস্কৃত ছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিন বছরের জন্য বহিস্কৃত অবস্থায় ছিলাম এবং কোনো রাজনৈতিক দলভুক্তও ছিলাম না। সুতরাং কোনো দলের বা ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে আমার কমিটিতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যেহেতু আমার প্রস্তাবের মধ্যে স্থগিত ভাষা আন্দোলন নতুন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভিত্তিতে সূচিত ও জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ ছাত্ররা দেখতে পেরেছিলেন তাই তারা সদ্য গঠিত কমিটির সদস্যদের বৈঠকে আহ্বায়ক নির্বাচনের প্রশ্নকে বাতিল করে সাধারণ ছাত্রদের সেই সভাতেই (১১ই মার্চ, ১৯৫০) আহ্বায়ক নির্বাচনের বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে তারা আমাকে কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত করেছিলেন।

কমিটির বৈঠক ডাকার দায়িত্ব আহ্বায়কের কিন্তু আমি কমিটির বেশ কয়েকটি বৈঠক ডেকেও কমিটির সদস্যদের বৈঠকে সামিল করতে পারিনি। কেন এমন হচ্ছে এবং কমিটির বৈঠক না হওয়ার পরিণতি কি হতে পারে তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম সাধারণ ছাত্ররা যে আশা ও ভরসা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিলেন তাকে বাস্তবায়িত করার ও কমিটিকে রক্ষা করার দায়িত্বও সাধারণ ছাত্ররা আমাকে আহ্বায়ক নির্বাচনের মাধ্যমে আমার ওপর অপর্ণ করেছিলেন। এই দায়িত্ব কিভাবে পালন করা যায়, কমিটিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় ?

অনেক চিন্তা করে দেখলাম, কিছ, অর্থ সমাগম ব্যবস্থা এবং কমিটি গঠনের খবর ও কমিটির উদ্দেশ্য জমগণের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই ঐ মুহূর্তের প্রধান কাজ। যদি কমিটির তরফ থেকে বাংলা ভাষার দাবীতে একটা পতাকা দিবস উদ্‌যাপন করা যায় তাহলে একই সঙ্গে দুটো কাজই হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পতাকা দিবস পালনের আলোচ্যসূচী দিয়ে আমি কমিটির পরবর্তী বৈঠক আহ্বান করলাম। নোটিশ বই এর মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যকে আলোচ্যসূচী জানিয়ে তাদের সেই নিয়ে এই বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করেছিলাম।

এই বৈঠকেও কোনো সদস্য উপস্থিত না হওয়ায় আমি কমিটির ধারা বিবরণী খাতায় লিখলাম, 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পতাকা দিবস পালনের প্রস্তাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অত তারিখের বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল।'

পতাকা দিবস পালনের এইভাবে 'সব সম্মতভাবে গৃহীত' প্রস্তাবটি নিয়ে আমি বাংলাকে সমর্থন করে এমন একমাত্র দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ছাপার জন্য দিয়ে আসলাম। আমাকে নিউজ সেকশনের মাহবুব জামাল জাহেদী প্রস্তাবটি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন ঢাকার মাত্র তিনটি দৈনিক প্রকাশ হতো। দৈনিক আজাদ ও মনিং নিউজ ওটা ছাপবে না জেনে পত্রিকা দুইটিতে যাই নি।

পরের দিন অবজারভারে পতাকা দিবসের কর্মসূচী প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির একজন সদস্যও আমাকে জিজ্ঞেস করেন নি, বৈঠকে কারা উপস্থিত ছিলেন, পতাকা দিবসের কর্মসূচী কি বা কিভাবে দিবসটাকে সফল করা যায়। ভাষার বিষয়টা জাতিসত্তার সাথে বাস্তবে সম্পর্কিতভাবে না দেখার কারণে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছাত্র সংগঠন বা তাদের সমর্থিত রাজনৈতিক দলগুলি ভাষা আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতেন এবং এই আন্দোলন যে সফল হবেই এ বিশ্বাস তাদের ছিল না। এই কারণেই প্রধানত ঐ সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির তথা নিজেদের ওপর বিশেষ আস্থাও ছিল না।

পতাকা দিবসের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দেখেই পকেটে কিছু পয়সা নিয়ে বের হলাম। সর্ব প্রথম শিশি-বোতলের দোকান থেকে একই প্রকারের এক ডজন কোটা কিনে ঝালাইর দোকানে পয়সা ফেলার কোটার মত ক'রে সেগুলি ঝালাই করতে দিলাম। তারপর একটা প্রেসে দুই হাজার "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা চাই" এবং "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি" লেখা সম্বলিত ছোট আকারের পতাকা ছাপতে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা ১০/১২ জন সাধারণ ছাত্র কোটা ও পতাকাগুলি নিয়ে সেক্রেটারিয়েট ভাঙ্গার সময় সেক্রেটারিয়েটের দুই গেট এবং তার আশে-পাশের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে পতাকাগুলি লাগিয়ে বা হাতে হাতে দিয়ে সাধ্যমত সহায়তা করার আবেদন জানালাম। অনেকেই পতাকা পিন দিয়ে লাগিয়ে দেওয়াতে আপত্তি জানালেও প্রায় সকলেই উৎসাহ ও আনন্দের সাথে টাকা, সিকি, আধূলি কোটার দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর বাংলা ভাষার জন্য তৎপরতায় তারা অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন।

এই সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষার জন্য ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে অত্যন্ত বলিষ্ঠ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৫২

সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারাই সেক্রেটারিয়েট বজরন করে গায়েবী জানান। ও পরে মিছিলে শরিক হয়ে এবং ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণ ধর্ম-ঘট ও হরতাল পালন করে ২১শের ভাষা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছিলেন। আমাদের দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা সব সময় আমাদের পাশে থেকেছেন।

পতাকা বিলি ও বিক্রয়কারী বন্ধুদের কাছ থেকে কোটাগুদুলি নিয়ে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে পরের দিন মধুর ক্যান্টিনে সকাল ১০ টায় কোটাগুদুলি খোলা হবে। কোটাগুদুলি নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কত হতে পারে। কেউ পাঁচশ টাকার বেশী ধারণা করতে পারেন নি। আমি বলেছিলাম, আমরা হাজারের উপরও পেতে পারি।

পরের দিন সংগ্রহকারীদের উপস্থিতিতে কোটাগুদুলি খোলা ও গণনার সময় বেশ কিছু সাধারণ ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গণনায় মোট ৯১৮ টাকা পাওয়া গেল। পরের দিন পোস্টার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

পতাকা দিবস পালন মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ভাষা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচী মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী হতে পেরেছিল। এরপর থেকে কমিটির সদস্যগণও উদ্যোগী হতে থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির প্রাক্কালে ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করত। কমিটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে ছাত্রদের তা নিজ নিজ এলাকায় বিলি করার জন্য দিত এবং তাদের বলে দিত তারা যেন সেগুদুলি বিলি ছাড়াও তাদের এলাকায় ছাত্রদের সংগঠিত করে এবং প্রচারপত্র, পোস্টার, সভা, মিছিল ইত্যাদি মাধ্যমে জনগণকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে সচেতন করে।

এর ফলে সাধারণ ছাত্রদের কাজ দেওয়া ও সক্রিয় করা এবং বাংলা ভাষার দাবীর কথা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। ছুটি শেষে তারা অভিজ্ঞতার কথা কমিটিকে জানাতেন। সন্দীপের এক বন্ধুর অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখার মতো।

বাংলাদেশের সর্বত্র শীতকালে ওয়াজ মহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের এই বন্ধুটি তার এলাকার ঐ রকম এক ওয়াজ মহফিলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। এতে মওলানা সাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে ওয়াজে সামিল ধর্মপ্রাণ লোকদের বেলিছিলেন, তারা যেন ছাত্রটির কথাকে গুরুত্ব না দেয়। কারণ, উদ্‌ হু হল ইসলামী তথা আল্লার ভাষা, আর বাংলা হল বিধর্মীদের ভাষা। সুতরাং পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যায় না এবং যারা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার কথা বলে তারা হল প্রকারান্তরে ইসলামের দুষমন।

মওলানা সাহেবের এই কথার প্রেক্ষিতে আমাদের ছাত্র বন্ধুটি দু'টি কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু মওলানা সাহেব তাঁকে আর কথা বলতে দিতে নারাজ। কিন্তু আমাদের ছাত্র বন্ধুটিও নাছোড় বান্দা। সে উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে আবেদন জানায়। অবশেষে সকলের অনুরোধে মওলানা সাহেব তাকে দু'চার কথা বলতে দিতে অনেকটা বাধ্য হয়েই রাজি হন।

মঞ্চে এসে আমাদের বন্ধুটি বেলিছিলেন, ভাই সব, আমি আপনাদের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাদের সকলেরই আত্মীয়-স্বজনদের কেউ না কেউ পরলোকবাসী হয়েছেন। আপনাদের সেই সব আত্মীয় পরিজনদের সাথে আপনাদের হয়তো কখনো স্বপ্নে সাক্ষাত এবং কথাবার্তা হয়। তখন তাঁরা আপনাদের সাথে কোন ভাষায় কথা বলেন? তখন নিশ্চয় আপনাদের মাতৃভাষা বাংলাতেই তাঁদের সাথে কথাবার্তা হয়। যে ভাষা আল্লার পরকালে প্রচলিত, যে ভাষায় আপনারা জান্নাতবাসীদের সাথে কথাবার্তা বলেন, সে ভাষা কিভাবে ইসলাম বিরোধী হয় সে কথা আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন। আর সেই ভাষাকেই যদি আমরা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবী করি তাহলে আমাদের অপরাধটা কোথায় আর কিভাবেই বা আমরা ইসলাম বিরোধী হই?

বন্ধুটির এই কথার কোনো জবাব দিতে না পেয়ে মওলানা সাহেব চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। এবং ওয়াজ মহফিলের অসংখ্য মানুষ সেদিন বুদ্ধে-ছিলেন যে বাংলা ইসলাম বিরোধী ভাষা তো নয়ই, বরং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীও মোটেই অযৌক্তিক নয়।

পতাকা দিবস পালনমাধ্যমে কাজ শুরুর করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বিভিন্ন ধরনের প্রচার ও সংগঠনিক কাজের ভিত্তিতে ধাপে ধাপে বাংলা ভাষার আন্দোলন এগিয়ে নিয়েছিল। বছর খানেক বিভিন্ন

প্রস্তাভমূলক তৎপরতার পর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি নতুন উদ্যোগ ও প্রেক্ষিতে ১১ই মার্চ (১৯৫১) উদ্ঘাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি নিজের প্রচারপত্রটি ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচার করেছিল :

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালন করুন

তিন বৎসর পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ আমরা ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করি। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলাকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে বাদ দেওয়ার চক্রান্তকে প্রদেশব্যাপী আন্দোলন করে আমরা বানচাল করে দেই।

আমাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে তদানিন্তন মন্ত্রীসভা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, উদ্দুর সাথে বাংলাকেও সমগ্র পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

কিন্তু সে অঙ্গিকার এখনও প্রতিপালিত হয় নাই; বাংলাকে এখনও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয় নাই; শিক্ষার মাধ্যম করা হয় নাই। বরং ঘৃণ্য বিপিসি সুপারিশে ষড়যন্ত্র করে বাংলাকে সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে 'আরবী হরফে বাংলা লেখার' হীন চক্রান্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করতেও অতটুকু লজ্জাবোধ করে নাই।

বন্ধুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কতৃপক্ষের এই ফ্যাসিস্ট মনোভাবকে সমূলে বিনষ্ট করে আমাদের বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম ক্ষান্ত হতে পারে না।

অতএব আসুন—আমরা ১১ই মার্চ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-ঘট ও সভা করে আমাদের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে পুনরায় লোহদড় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা করতে কতৃপক্ষকে বাধ্য করি।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা—করতেই হবে।

ছাত্র ঐক্য—জিন্দাবাদ

(বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ)

দ্রষ্টব্য : পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি — বদরুদ্দীন
ওমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮০

১১ই মার্চ, ১৯৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের পর এই প্রথম ১১ই মার্চ পালনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হয়। ছাত্ররা ভাষার দাবীতে সোচ্চার হতে থাকে। সাধারণ মানুষ ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়াতে থাকে। এটা সম্ভব হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগ ও ভূমিকার জন্য।

অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যা ও ব্যাপকতায় ধর্মঘট, সভা ও মিছিলের মাধ্যমে ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ পালনের মধ্য দিয়ে বোঝা গিয়েছিল ভাষা আন্দোলন ভাটার স্তর কাটিয়ে জোয়ারের স্তরে উপনীত হতে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আইন পরিষদের সকল সদস্যের কাছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবীতে একটা স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

জনাব বদরুদ্দীন ওমর তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইর ৩য় খন্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ অপর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেটা হলো, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রণয়ন করা এবং তা কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার কাছে পাঠানো। সেই সময় সংবিধান সভার অধিবেশন করাচীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এ ছাড়া পাকিস্তানের উভয় অংশের সংবাদপত্রের কাছেও স্মারকলিপির কপি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেখ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রভৃতিকে নিয়ে একটি স্মারকলিপি খসড়া কমিটি গঠিত হয়”।

হয়তো এই রকম একটি কমিটি গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু তার সদস্যরা কোন স্মারকলিপি রচনা করেন নাই। আমি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও সামসুর রহমান (জনসন) ও আরো দু'একজনের কাছে স্মারকলিপি লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কারো কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে অবশেষে আমিই স্মারকলিপিটি লিখেছিলাম। এ কথাটা আমি ওমর সাহেবকেও বলেছিলাম। যেহেতু স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে এবং এদের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন অবাস্তাব্য সেইহেতু স্মারকলিপিটি ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। স্মারকলিপিটি

একটি ঐতিহাসিক দলিল বলে আমি মনে করি। এই কারণে দলিলটির
অনুবাদের সাথে মূল কপি বইর পরিশিষ্টে দেওয়া হোল :

সমীপেষ,

.....

সদস্য, গণপরিষদ

করাচী, পাকিস্তান

জনাব,

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যারা তিন বছর পূর্বে পূর্ব বাং-
লায় ভাষার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলাম তারা বাংলাকে পাকিস্তানের
রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে
সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশী দৃঢ় সংকল্প। আমরা সেই ছাত্ররা আপনাদের
সকলের করাচীতে একত্রিত হওয়ার উপলক্ষকে সামনে রেখে আরো একবার
আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের জন্য আপনাকে তাগাদা দেব।

এই আন্দোলন দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এটা বড়ই পরিতাপের
বিষয় যে, যখন আমাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য জাতির উন্নয়নমূলক কাজে
নিয়োগ করা প্রয়োজন তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাংলাকে পাকি-
স্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অস্বীকৃতি দ্বারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ
জনসমষ্টির মনে অবিশ্বাস ও ভীতি সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের এই আশংকা বাস্তবসম্মত এবং যতক্ষণ এই আশংকা দূরী-
ভূত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের পূর্ববর্ণিত কর্মকান্ড এমন একটি
জাতিকে দূরে ঠেলে দেবে যাদের সর্বাঙ্গিক সহযোগীতা ছাড়া পাকি-
স্তানের ঐক্য ও সংহতির স্বপ্ন কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না।

আঞ্চলিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি থেকেই পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটে-
ছিল অথচ এই নবীণ দেশটিকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই এখনও
জীবন-মরণ-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বহুগতভাবে এবং চেতনাগতভাবেও পূর্ণত
মুক্ত হওয়ার জন্য ইংরেজী ভাষার মাত্রাতিরিক্ত চাপ লাঘব ও প্রতিবন্ধকতা
দূর করে পাকিস্তানের ভাষাগুলির জন্য স্থান করে দেওয়ার দৃঢ় কাজটি
করতে হলেও দীর্ঘ ও দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হবে। কেবল মাতৃ-
ভাষাই যেহেতু মানুষের অন্তর্নিহিত অধিমানসিক ক্ষমতাসমূহকে বিকশিত

করার জন্য সর্বশোষণ তাই মাতৃভাষাকে কোনো স্বাধীন জাতিই অবহেলা করতে পারে না। বিদেশী ভাষার আধিপত্যই যে নিকৃষ্টতম প্রভুত্ব এবং একটি জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য উপযোগী, বিংশ শতাব্দীর সূচনার ফার্সী ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে ইংরেজী ভাষাকে প্রবর্তনকালে ইংরেজরা তা ভালভাবেই জানত।

স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই করাচীর সরকারী মহলের কথাবাতা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা উদ্দীপ্ত পাকিস্তানের ভবিষ্যতের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বলে ধরে নিয়েছেন। আর কেন্দ্রের তরফ থেকে বাংলা ভাষাকে বেমালুম ভুলে যাওয়া দেখে পাকিস্তানের এই অঞ্চলের মানুষরা সে দিন আংকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার প্রতিটি স্কুল কলেজ এবং পত্র, পত্রিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদের গুরুগম্ভীর গর্জন উঠিত হয়েছিল। শাসক গোষ্ঠীর ভাষা সংক্রান্ত এই রকম জ্বরদন্তি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ রুখে দাঁড়িয়েছিল। অসংখ্য প্রতিবাদ সভা হয়েছিল, ছাত্ররা পথে নেমে পড়েছিল এবং কারাবরণ করেছিল। পূর্ব বাংলার যুবশক্তিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার সব রকম পন্থা অবলম্বন করার পরও পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে নতজানু হয়ে বাংলাকে আঞ্চলিক সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার নিশ্চয়তা প্রদান এবং উদ্দীপ্ত পাশাপাশি স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিজয় অর্ধসমাপ্তই মাত্র হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় ও নির্দিষ্টভাবে তাদের এ সম্পর্কিত নীতি এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রের নীতির বরখেলাপ করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সবচেয়ে বড় ভুল করবে।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে কোনো দেশে একটি ভাষা থাকলে সমস্যার সমাধান হয় সহজ। আর একাধিক ভাষা থাকলে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা যদি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়ে থাকে এবং সেই ভাষার উৎকর্ষ সাহিত্য থাকে তাহলে বিনা দ্বিধায় সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যায়। আর যদি অন্য ভাষাভাষী সংখ্যালঘুরা তাদের ভাষার দাবীতে সোচ্চার হয় তাহলে আমরা কানাডা বা সুইজারল্যান্ডের মত কয়েকটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে দেখতে পাই।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বাংলাই হয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য ভাষা। বাংলা হল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা (পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন মানুষ বাংলাভাষী) এবং বাংলা কেবল পাকিস্তানের নয়, সমগ্র উপমহাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। এই ভাষার হাজার বছরের ওপর প্রাচীন ইতিহাস আছে এবং এই ভাষার আছে বিকশিত হওয়ার ও বিদেশী ভাষার প্রভাবে আত্মস্থ করার অদ্ভুত প্রাণশক্তি। বিগত একশত বছরে এই ভাষার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে এবং এই ভাষা মাটির রস থেকেই তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণ করতে পারে। কেবল তাই না, এই ভাষার সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, উর্দু ও ফার্সী ভাষার সাথে গভীর মূলগত সংযোগ আছে। এ ছাড়া বাংলা এমনি একটা ভাষা যা পাশ্চাত্য সাহিত্যের মর্মবস্তুকে আত্মস্থ করেছে। উৎপত্তি সূত্রে প্রাচ্য হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষাটি উপমহাদেশের ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

মন্ত্রীসভা ও সচিবালয়ের কিছ, সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উর্দুভাষী হওয়ার কারণে উর্দু কেন্দ্র সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষাটি কোনো কারণেই বাংলার তুলনায় উৎকৃষ্টতর হওয়ার যোগ্য না। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের মানুষের মাতৃভাষা না এবং বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচ ও পাঠান নির্বিশেষে সকলের কাছে সমভাবে বিজাতীয়। উর্দু হল ক্ষয়িক্ষ, সংস্কৃতির প্রতীক। কোথাও এর শক্ত শিকড় নেই এবং রাজকীয় অনুকূল্য ব্যতিরেকে এই ভাষাটি টিকতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাকিস্তানের দৃষ্টা এবং উর্দু ভাষার এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ইকবাল পর্যন্ত উর্দুকে তার জটিল ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে যথেষ্ট মনে করেন নাই। তাঁর মহান দার্শনিক কাব্য “আশরাফ-ই-খুদা” রচনার ভাষা হিসাবে উর্দুকে বাদ দিয়ে ফার্সীকে অবলম্বন করতে হয়েছিল এবং তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছেন :

আমার ভাবের বিশালত্বের কারণে
ফার্সীই কেবল হতে পারে তার উপযোগী।
(‘অহমের রহস্য’, পৃঃ ১৫, পংক্তি ১৮৩-৮৪)

এমন একটি ভাষা যা রাজনৈতিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতার প্রশ্নে সমূহ সন্দেহের উদ্বেক করে এবং যে ভাষাটি মনুদ্রনের ক্ষেত্রে অপরিসীম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় সে ভাষাটি কোনো ক্রমেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।

স্বাধীন সংশ্লিষ্ট মহল থেকে উদ্‌র স্বপক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থিত করা হয়। এই ভাষাটিকে ইসলামীয় ভাষা হিসাবে দাবী করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি না যে আল্লাহর দুনিয়ায় কোনো ভাষা ইসলামীয়, খৃষ্টীয় বা কোনো ধর্মীয় হতে পারে। আর উদ্‌ ইসলামীয় হলে তো বাংলাও তাই, বরং আরো বেশী, কারণ অনেক বেশী সংখ্যক মুসলমান বাংলায় কথা বলেন। দ্বিতীয়ত, উদ্‌কে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যকার ঐক্য সংযোগকারী উপাদান সম্পন্ন ভাষা বলা হয়। এর দ্বারা যদি বোঝাতে চাওয়া হয় যে উদ্‌ বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশগুলির একটা সাধারণ ভাষা হিসাবে কাজ করতে পারে তাহলে এর চেয়ে উদ্‌ট কথা আর কিছু হতে পারে না। কারণ এটা পাকিস্তানের সকল অংশেই সমান বিদেশী। একটা সাধারণ ভাষা সব সময়ই একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতি, সাধারণ ভাষা কখনও কোনো সরকারের কৃত্রিম সৃষ্টি রূপে হয় না।

সুতরাং ইসলামীয় ভাষা, যা হল উদ্‌ট কিংবা সাধারণ ভাষা, যা হল অলীক, কোনোটার কারণেই উদ্‌ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবীদার হতে পারে না।

এতদসত্ত্বেও যদি উদ্‌কে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তাতে অবশ্যই এই সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হবে : ১) এর দ্বারা ইংরেজী মাধ্যমে যেমন একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তেমনি উদ্‌ মাধ্যমে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হবে। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা উদ্‌ভাষী নন তাদের পক্ষে রাতারাতি উদ্‌ অন্বেষণ করা সম্ভব হবে না। এর দ্বারা ব্যাপক মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের দ্বারা শোষণের পথকে উন্মুক্ত করা হবে, ২) এতে সাধারণ ভাবে পাকিস্তানীদের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এবং দেশব্যাপী সংহতির মূলে আঘাত হবে, যে সংহতি ছাড়া দেশটার কোনো ভবিষ্যতও থাকবে না, এবং সর্বশেষ ৩) যে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ সম্ভব করে একটি দেশের সংস্কৃতিগত বিকাশ ঘটে তা হবে দারুণ ভাবে বিঘ্নিত। একটি জাতি কেবলমাত্র তার নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই পারে যথাযথভাবে শিক্ষিত হতে ও চিন্তা করতে। কোনো জাতির প্রাকৃতিক ভাষাকে অস্বীকার করার অর্থ সেই জাতির সব কিছুকে অস্বীকার করা। আর কোনো জাতির ভাষা অপহরণ করা সেই জাতির স্বাধীন সত্তাকে কল্পকাহিনীতে পরিণত করারই নামান্তর।

সর্বশেষে আমরা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করব, যে কথা আমরা বার বার ব্যাখ্যাইন ভাষায় বলে আসছি। সেটা হল : পাকিস্তানে যদি একটা ভাষাকে

রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে সেটাকে হতে হবে অবশ্যই বাংলা। আর যদি একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে বাংলাকে হতে হবে তার অন্যতম। এই সহজ যুক্তিটা আমাদের শাসকদের মস্তিস্কের মধ্যে অমুদ্রবেশ করতে কিভাবে ব্যর্থ হয় সেটা উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। সব দেখে শুনে মনে হয় নিশ্চয় কোথাও মস্ত গন্ডগোল আছে। তা না হলে সোনালী আঁশের এই দেশটির ওপর এই অন্যায্য ও বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করাই কঠিন।

করাচীর স্বপ্নাচারীরা যাদের কনকুহর বুদ্ধি, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের আত্মনাদ ঢোকে না তারা দিগ্বিদে এই প্রদেশে কেমন আরবী শিক্ষার আশ্রয়সমূহ প্রতিষ্ঠাকল্পে হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করে চলেছেন। কোনোদিন ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হবে এই সুখকর আশা নিয়ে ঐ সব স্বপ্নাচারীরা উদ্ভূত সর্বোত্তম সহায়তা করে চলেছেন এবং বাংলার ওপর আরবী হরফ চাপিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছেন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যারা ভাষার ব্যাপারে এই মনোভাব প্রাদেশিক নীতি কার্যকরীকরণের দাবী করছি এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করছি তারা অতীতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর জন্য ভালই লড়েছি এবং ভবিষ্যতে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা কখনই উদ্ভূত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নেব না। আমরা পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বিরাট যে যত্ন চলেছে তাকে উন্মোচন করে দিতে প্রতিশ্রুত বন্ধ।

আমরা সেই সব চক্রান্তকারীদের এবং জনগণের সেই সব প্রতিনিধিদের, যারা রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে অধিষ্ঠিত আছেন তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যতদিন না বাংলা ভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রদেশ এবং কেন্দ্র পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে ততদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তথা সমগ্র ছাত্র সমাজ ক্ষান্ত হচ্ছি না।

তারিখ : ১১ই এপ্রিল
১৯৫১

স্বাক্ষর : আবদুল মতিন
আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি তাদের স্মারকলিপি মাধ্যমে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ তথা সরকারের কাছে বাংলাকে

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যে বক্তব্য পেশ করে একটা জাতির ভাষার দাবীতে এমন দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সামগ্রিক রাজনৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন ইতিপূর্বে কোনো মহল থেকে সে রকম বক্তব্য উত্থাপিত হয় নাই। স্মারকলিপি জাতির ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক ছিল। আন্দোলনের বিকাশ ও কর্মকান্ড স্মারকলিপির প্রতিটি বক্তব্য তথা মূল্যায়নকে সঠিক প্রমাণিত করেছে। স্মারকলিপি আন্দোলনের দিশাও নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের বিকাশের গতিধারা স্মারকলিপিতে উপস্থাপিত রূপরেখা অনুসরণ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে ও আন্দোলনের বিশাল বিস্তার মাধ্যমে জয়যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিল। ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতার পর বাংলা ভাষার ও তার সাথে সাথে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা বিরোধী শাসক শ্রেণীরও ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল। এরপর পরাজিত ও নিঃশেষিত-প্রায় শাসক শ্রেণীর তরফ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিমূলক ঘোষণা শাসকশ্রেণীর মুখ ও শেষরক্ষার শূন্যগর্ভ আনুষ্ঠানিকতার পর্যবেশিত হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির স্মারকলিপি সমগ্র পাকিস্তানে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী দৈনিক খাইবার মেইল তার সম্পাদকীয়তে স্মারকলিপির বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছিল। স্মারকলিপির বক্তব্যে অনুপ্রাণিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের বক্তব্য পাকিস্তানের প্রধানতম পত্রিকা পাকিস্তান টাইমস্ এ প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালীরা ঐ পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষার দাবীকে সমর্থন এবং বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনের পুনঃ সূচনার তাঁদের আনন্দ ও আস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি পাকিস্তানের সংবিধান সভার কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, কমিটি চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য সমগ্র ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করার পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। এই মর্মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি যে প্রচারপত্র বিলি করেছিল তার বক্তব্যও প্রাধান্যবোধ্য। প্রচার পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

“স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করুন ও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করুন”

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম। এবং সেই দাবীর উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের রাষ্ট্র গঠন করবো এই প্রতিশ্রুতিই আমরা জনসাধারণকে দিয়েছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের উপর লোক বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। উদ্ভূত সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষার প্রচলন নাও থাকতো তাও আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন করতাম। কারণ, পাকিস্তানের উন্নতি, পূর্ণবিকাশ ও একতার জন্য বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাকিস্তানের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও একতার ওপর লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করেছিলাম। কিন্তু তখন কেউ কেউ আমাদের ভুল বুদ্ধি ছিল ও সরকার এই দাবীকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। ন্যায্য ও জনগণের দাবীকে জোর করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই এই আন্দোলন আজ ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে ও দিন দিন সবল হচ্ছে। এই আন্দোলনকে সমর্থন করে পাকিস্তানকে সবল করা আজ যুবসমাজের কর্তব্য। এই আন্দোলনে জয়যুক্ত করা জাতির এই সংকট মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন। কারণ, ৪১১ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ার অর্থ জাতিকে দুর্বল করা।

আমরা আজ দুর্বল হতে চাই না, চাই সবল হতে। তাই বন্ধুগণ, পাকিস্তানকে সবল করতে হলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনারা নিভয়ে এগিয়ে আসুন ও আপনাদের স্থানীয় এলাকার রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করুন। তারপর আমরা প্রত্যেক এলাকার প্রতিনিধি নিয়ে এক সম্মেলন করবো ও সমবেতভাবে আমাদের দাবী জানাব। তখন আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আপনারা এই মহৎ কর্তব্যে এগিয়ে আসুন। জনসাধারণকে বুদ্ধি দিয়ে দিন বাংলা রাষ্ট্র-

ভাষা না হলে পাকিস্তানের কত অনিষ্ট করা হবে। আমরা পাকিস্তানের অনিষ্ট চাই না তাই যারা অনিষ্ট করতে চায় তারা যাতে মিথ্যা প্ররোচনা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে তা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং তা করা তখনই সম্ভব যখন আমরা সংগঠিত হব। আজ সংগঠনের আশা প্রয়োজন। বন্ধুগণ, আপনাদের স্থানীয় এলাকা সংগঠন করুন ও স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন। আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করুন।

ঢাকা, ৮ই সেপ্টেম্বর (বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ)

১৯৫১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির এই প্রচার পত্রটির মূল বিষয় ছিল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী। প্রচারপত্রে বর্ণিত ছিল : জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বাস্তব রূপ হবে—দেশের সর্বাধিক জনসংখ্যাসম্পন্ন জাতির ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি। শাসকদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে শক্তিশালী করা হলেও শাসক শ্রেণী যদি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয় তাহলে তা সকলের জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি শাসকরা জাতির ভাষার এ অধিকার ও দাবীকে মেনে না নেয়, জবরদস্তি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের এবং যারা একটি জাতি ও তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেয় তাহলে তা রাষ্ট্রের জন্য এবং তখনও যা দেশ হিসাবে একক সেই দেশের জন্যও অমঙ্গলজনক। সুতরাং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করার নীতি রাষ্ট্রকে দুর্বল করবে এবং দেশকে করবে ক্ষতিগ্রস্ত। জাতি হিসাবে বাঙ্গালীরা নিজেদের সাথে সমগ্র দেশেরও মঙ্গল চায়, সমগ্র দেশের ঐক্য চায়। অর্থাৎ তাদের ভাষার দাবী তথা স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে নিলে বাঙ্গালী জাতি একই দেশে অস্তিত্ব, এমন কি একই রাষ্ট্রের প্রশাসনাধীনে থাকতে চায়। শাসক শ্রেণীর উচিত বাঙালী জাতির ভাষার ন্যায়সঙ্গত এই ন্যূনতম দাবী মেনে নেওয়া।

শাসক শ্রেণী যদি জাতির ন্যায়সঙ্গত ন্যূনতম দাবী ও অধিকার না মানে তাহলে দেশ ও রাষ্ট্রের ঐক্য থাকবে না, উভয়ই হবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল। এর অর্থ, সে অবস্থায়, অর্থাৎ শাসক শ্রেণী জাতির দাবী ও অধিকার মেনে না নিলে জাতিকে বাঁচার জন্য পথ দেখতে হবে। জাতি এখনও সে চরম পথ, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ অবলম্বন করতে চায় না।

তবে শাসক শ্রেণী যদি তাদের নূনতম দাবী ও অধিকারটুকু মেনে না নেয় তাহলে তাদের বাধ্য হয়েই সেই পথ অবলম্বন করতে হবে।

এই হল পাকিস্তানের নির্দিষ্ট অবস্থায় বাঙ্গালী জাতির দ্বন্দ্বমূলক-ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য দাবীর বাস্তব রূপ ও সেই অধিকারের জন্য সংগ্রামের সঠিক ধরন। প্রচারপত্রের ভাষায় সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলা না হলেও প্রচারপত্রের বক্তব্য মর্মবস্তুর্তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণই হয়। প্রচার পত্রের বাংলা ভাষার দাবীতে দেশব্যাপী সংগঠিত হওয়ার এবং বিজয়ের জন্য সাহসী হওয়ার আহ্বানের মর্মকথা তাই দাঁড়ায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এ প্রচারপত্র প্রকাশের মাধ্যমে ঐ আহ্বানের ৫ মাস আগে এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে সেই কথাই পরিষ্কার ভাষায় স্মারক-লিপির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গণপরিষদ সদস্যদের স্মারকলিপির মাধ্যমে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানোর পাঁচ মাস পর তাদের প্রচার পত্রটি স্মারকলিপির মূল কথা বিবেচনার জন্য সেই দাবী অর্থাৎ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য শাসক শ্রেণীর কাছে জাতির তরফ থেকে লিখিত আকারে শেষ আবেদন ও অনুরোধ ছিল। শাসক শ্রেণীর তথা রাষ্ট্রের তরফ থেকে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার পরিণতিতে দেশের যদি কিছু হয়, অর্থাৎ পরি-নামে দেশ বিভক্ত হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসংখ্যাসম্পন্ন জাতিকে ভিন্ন পথই যদি অবলম্বন করতে হয় তাহলে তার জন্য সকল দায়দায়িত্ব যে রাষ্ট্রের অধিকর্তা শাসক শ্রেণীর সেই কথাও প্রকাস্তরে প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল।

শাসক শ্রেণীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির স্মারক-লিপি ও প্রচারপত্রের সহজ-সরল এবং দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষা ও বক্তব্য না বোঝার কথা না। কেবল আমাদের দেশে নয়, আমাদের মত সকল দেশেরই শাসকশ্রেণী অস্ত্র ও সেনাবাহিনীর ওপর আধিপত্য, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রটি তাদের হওয়ার কারণে, আমলারা সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক হওয়ার কারণে অর্থ-নীতিতে তাদের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা এবং জনগণের অসচেতনতাও অসংগঠিত অবস্থার সুযোগে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও শাসক শ্রেণী তাদের শাসন অব্যাহত রাখতে ও জনগণের স্বাধীনবিরোধী সিদ্ধান্ত কিছুকালের জন্য হলেও

চাপিয়ে দিতে পারে। ক্ষমতার দপে' মদমন্ত ও সামরিক নিরাপত্তার নিশ্চ-
য়তার মোহাচ্ছন্ন শাসকরা দেয়ালের লিখন দেখতে পায়না বা বড় বিলম্বেই
মাত্র দেখতে পায়।

১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হও-
য়ার পর ভাষা আন্দোলনের তৎপরতা নতুনভাবে শুরূ হয়। এরই প্রতি-
ক্রিয়া হিসাবে শাসক শ্রেণীর মধ্যেও ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ষড়যন্ত্রমূলক
তৎপরতা শুরূ হয়। এ সম্পর্কে তথ্যের কিছু, কিছু ভুল সত্ত্বেও কেবলমাত্র
বদরুদ্দীন ওমর সাহেবের বই 'পূর্ব' বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন
রাজনীতি'তে এ বিষয়ের তথ্য ও মর্মবস্তুর বিবরণ পাওয়া যায় :

"১১ই এপ্রিল, ১৯৫১ তারিখে (১৯৫০, আঃ মতিন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-
লয় কর্মপরিষদের তরফ থেকে আহবানক আবদুল মতিনের স্বাক্ষরে উপরোক্ত
স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও
দেশের দুই অংশের বিভিন্ন সংবাদ পত্রের কাছে পাঠানো হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাগুলির মধ্যে লাহোরের ইংরেজী দৈনিক
'পাকিস্তান টাইমস' এ সংবাদ হিসাবে স্মারকলিপিটির উল্লেখ করা হয়।
এ ছাড়া পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'খাইবার মেইল' ২০শে
এপ্রিল, ১৯৫১ তারিখে স্মারকলিপিটির উপর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ
করে। নিম্নলিখিত এই সম্পাদকীয়টি ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান
অবজারভার' এ ৫ই মে, ১৯৫১ তারিখে এবং সিলেটের সাপ্তাহিক 'নও-
বেলালে ১০ই মে, ১৯৫১ তারিখে পুনর্মুদ্রিত হয় :

'কিছু দিন যাবৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বাদানুবাদ চলিয়া
আসিতেছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সমস্যা সমাধানের পথে কিছুটা
বাধা আছে সত্য। কিন্তু ভাষার মূলগত উৎকৃষ্টতার দিক দিয়া এইসব
বাধার কোনো হেতুই নেই। এতএব, যাহারা ছুতানাতাকে ভিত্তি করিয়া
তাহাদের দাবী খাড়া করেন তাহাদের আরো গভীরভাবে এবং দ্রুততর চিন্তা
করা প্রয়োজন।'

'করাচীর জনৈক সহযোগির (ডন নাহ) [করাচীর মনিং নিউজ-আঃ
মঃ] অদ্বিতীয় কথ্য ছাড়িয়া দিলেও একথা অতি সত্য যে, অবিভক্ত
ভারতের মুসলমানগণ অন্যান্য দাবীর মধ্যে উদ্দকে জাতীয় ভাষা করার
দাবীও করিয়া ছিলেন। উদ্দ ভাষাকে সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়া-

ছিল এবং সেটাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহা তখন যেমন প্রমাণ করিয়াছিল ঠিক তেমনি প্রমাণ করিতেছে যে, উর্দু সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ভাব বিনিময়ের এক সাধারণ বাহনস্বরূপ। পশতু, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী ভাষাগুলি একই আরবী অক্ষরে লিখিত হয় এবং যাহারা এই ভাষাগুলিতে কথা বলেন তাহারা অতি সহজেই উর্দু ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন। অতএব, পশ্চিম পাকিস্তানে এক নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ইংরেজীর পরিবর্তে উর্দু গ্রহণ করার কোনই অসম্ভাবনা হইবে না। কিন্তু বাংলা ভাষার দাবী কিছুতেই অবহেলা করা চলে না। পাকিস্তানের জনসংখ্যার অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী, এবং বাংলা ভাষার এক নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্য রহিয়াছে। উর্দুকে কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া চলে না। সুইজারল্যান্ডে ইটালিয়ান, জার্মান ও ফরাসী তিনটি ভাষাই বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা সরকারী ভাষা রূপে পরিগণ্য। লীগ অব নেশনস সরকারীভাবে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। জাতি সংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মুখপত্র ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। অতএব, আমরা মনে করি যে, বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের সরকারী ভাষা রূপে স্বীকার করা উচিত।

দুইটি সরকারী ভাষা প্রথম দিকে কার্যতঃ কিছুটা অসম্ভাব্য সৃষ্টি করিতে পারে এবং ব্যয়ভার বর্ধিত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু দুইটি ভাষার অবাধ সংমিশ্রণের ফলে জাতির ভিতর এক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে বাধ্য।

“১১ই এপ্রিল স্মারকলিপিটি পাঠানোর পর ১২ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি বৈঠক ফজলুল হক হলের ৬০ নম্বর রুমে বদিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান সংবিধান সভার পূর্ব বঙ্গীয় কিছু সংখ্যক সদস্যের কাছে টেলিগ্রাম যোগে অনুরোধ জানানো হবে যাতে তারা রাষ্ট্রভাষা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা প্রেরিত স্মারকলিপি সম্পর্কে পার্লামেন্টে শর্ট নোটিশ প্রদান উত্থাপন করেন। এরপর ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে কর্মপরিষদের আর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হলে ৭৬ নম্বর রুমে। বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, বদিউর রহমান, সালেহউদ্দিন, রুহুল আমিন চৌধুরী প্রভৃতি।

১৭ই এপ্রিলের এই বৈঠকের পর ঐদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র-ভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন, কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে নূরুল আমীন, ফজলুল হক, নূর আহাম্মদ, মিয়া ইফতেখারউদ্দীন, শওকত হারাত খান, ইব্রাহিম খান, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রভৃতিদের কাছে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন :

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আপনাদের কাছে জরুরী আবেদন জানানোছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে শর্ট নোটিশ প্রশ্ন উত্থাপন করতে। দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ প্রেরিত স্মারক লিপি।”

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক এইসব তৎপরতা সত্ত্বেও পাকিস্তান সংবিধান সভায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করেন নি। এ বিষয়ে লিয়াকত আলীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘকাল এক চক্রান্তমূলক নীরবতা বজায় রাখেন। এই নীরবতা শেষ পর্যন্ত ভঙ্গ হয় লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর ঢাকার ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের পল্টন ময়দান বক্তৃতার মাধ্যমে। কিন্তু সরাসরি সরকারীভাবে কেবলমাত্র উদ্‌কেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা না বললেও সেই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ভাষা বিতর্কে উদ্‌র স্বপক্ষে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা, কেন্দ্রীয় সরকার ও মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে অব্যাহত থাকে। এই প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫১ তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত সারা পাকিস্তান উদ্‌ সম্মেলন।”..... (শাসক গোষ্ঠি যে উদ্‌র স্বপক্ষে এই রকম যড়যন্ত্রমূলক চক্রান্ত চালাতে পারে এ কথা অনুমান করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির স্মারকলিপিতে উদ্‌ভাষা ও উদ্‌র ওকালতকারীদের সম্পর্কে এত বিষদ ভাবে বলা হয়েছিল—আঃ মতিন)

“পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী ফজলীও সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্‌ শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে উদ্‌ বিরোধিতা দূর করার আহ্বান জানান।”

✓ উপরোক্ত সম্মেলনে মওলানা আকরাম খানের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৮ই এপ্রিল ১৯৫১ তারিখে ঢাকার ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার ‘জাতীয়ভাষা’ শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলেন,

‘রিপোর্ট’ অনুযায়ী মওলানা আকরাম খান উদ্দ সন্মেলনে বলেছেন যে, পূর্ব বাঙলায় যারা উদ্দর বিরোধিতা করে তারা ইসলামের শত্রু। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি এই “শত্রুদের” মধ্যে ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো যারা উদ্দর পরিবর্তে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতি তাঁদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

পূর্ব বাঙলার অপর একজন সংবিধান সভার সদস্য বেগম ইকরামুল্লাহ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে অফিসে উদ্দ প্রবর্তন করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে এ কথা বলেন নি। কারণ, যদিও তিনি সেই অল্প সংখ্যক বাঙালী পরিবারের সদস্য যারা উদ্দভাষী তথাপি তিনি নিশ্চয় জানেন যে, তাঁর প্রস্তাব যদি বাস্তবতঃ গ্রহণ করা যায় তাহলে পূর্ব বাঙলার ৯০% সরকারী কর্মচারী যারা উদ্দ জানেন না তাঁরা তৎক্ষণাৎ চাকুরীচ্যুত হবেন..... ।’

“বাংলা ভাষার দাবী সমর্থন করার জন্য একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী সরকারী কর্মচারীকে ঢাকা থেকে বদলীর একটি ঘটনাও সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করা হয়।”

✓করাচীর উদ্দ সন্মেলনে আকরাম খান ও বেগম ইকরামুল্লাহ কতৃক নানা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য পেশ করার পর ঢাকা এবং পূর্ব বাঙলার অন্যত্র ছাত্র বুদ্ধিজীবীরা তার প্রতিবাদ করেন এবং প্রায় তিন সপ্তাহ পর্যন্ত সেই প্রতিবাদ আন্দোলন চলার পর ৭ই ও ৮ই মে, ১৯৫১, তারিখে দৈনিক অবজারভার “রাষ্ট্রভাষা” শীর্ষক অপর একটি সম্পাদকীয় দুই দফায় প্রকাশ করেন। ৭ই মে তারিখে তাতে বলা হয় :

‘রাষ্ট্রভাষার উপর এই দুঃখজনক বিতর্ক ইতিমধ্যেই ষষ্ঠে বিতন্ডার সৃষ্টি করেছে এবং একে রোধ করা না হলে এর পরিণতিতে অনেক কুৎসিত ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। আমরা আশা করি, করাচীতে রাজনৈতিক দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দেউলিয়াপনা বিরাজ করছে না। যদি বাংলা এবং উদ্দ উভয়কেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় তাহলে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝি সহজতর, অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও সুখকর হবে।’

“করাচীর উদ্দ সন্মেলনে মওলানা আকরাম খানের বক্তব্য যে বিতর্ক সৃষ্টি করে তারপর পূর্ব বাঙলায় রাষ্ট্রভাষা দাবীতে তেমন কোনো উল্লেখ-

যৌগ্য বস্তুতা বিবৃতি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। (রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ ক্ষেত্রে নির্ধারক শ্রেণী ও ব্যক্তিদের রাজনীতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকায় মওলানা আকরাম খানের মত চক্রান্তকারী, বাংলা বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন, বাঙ্গালী প্রত্যাখ্যাত অসদুস্থ ব্যক্তিটি সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান বা তার কথা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি সময়ের অপচয় ও জনগণকে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার সামিল মনে করেছিল—আঃ মতিন)। এই অবস্থায় সাংগঠনিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন (প্রকৃত ঘটনা ঐ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি “স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করুন ও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন” শিরোনামের একটা প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিল। ৩৪, ৩৫ পৃঃ দেখুন—আঃ মতিন)। এই প্রস্তাবের একটিতে (উল্লিখিত প্রচারপত্রে—আঃ মতিন) তাঁরা বলেন,

‘আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম। এবং সেই দাবীর উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের রাষ্ট্র গঠন করবো এই প্রতিশ্রুতিই জনগণকে দিয়েছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের উপর লোক বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। উদ্ভূত সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষার প্রচলন নাও থাকতো তবু আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন করতাম। কারণ, পাকিস্তানের উন্নতি, পূর্ণ বিকাশ ও একতার জন্য বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।’

‘ইতিপূর্বে’ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে প্রায় সব সময়েই অপরাপর কয়েকটি দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষার কথা উল্লেখ করা হতো। খুব সম্ভবত এই প্রথম এ কথা জোর দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ছাত্র নেতারা ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষার প্রচলন নাও থাকতো তবুও আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন করতাম। পূর্বে বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে জনগণের সংগ্রামী জীবন থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ক্রমশঃ এবং দ্রুত গতিতে

দৃষ্টিভঙ্গিক একটি আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি—আঃ মতিন) উপরোক্ত ঘোষণা তারই একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।”

৮ই সেপ্টেম্বর সভায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কর্ম পরিষদ অপর একটি প্রস্তাবে (উল্লেখিত প্রচারপত্র— আঃ মতিন) বলেন,

‘পাকিস্তানের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও একতার উপর লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী করেছিলাম। কিন্তু তখন কেউ কেউ আমাদের ভুল বুঝেছিল ও সরকার এই দাবী বানচাল করার চেষ্টা করেছিলো। ন্যায্য ও জনগণের দাবীকে জোর করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই এই আন্দোলন আজ ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে ও দিন দিন দিন সফল হচ্ছে। এই আন্দোলনকে সমর্থন করে, পাকিস্তানকে সফল করা আজ যুব সমাজের কর্তব্য। এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করা জাতির এই সংকট মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন। কারণ, সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ার অর্থ সেই ভাষাকে ধ্বংস করে দেওয়া। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার অর্থ জাতিকে দুর্বল করা। আমরা আজ দুর্বল হতে চাই না, চাই সফল হতে। তাই বন্ধুগণ, পাকিস্তানকে সফল করতে হলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনারা নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন ও আপনারা স্থানীয় এলাকায় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করুন। তারপর আমরা প্রত্যেক এলাকার প্রতিনিধি নিয়ে এক সম্মেলন করবো ও সমবেতভাবে আমাদের দাবী জানাবো। (৩১শে জানুয়ারী তড়িঘড়ি করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঐ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং সর্বোপরি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ঐ রকম সাংগঠনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষে উল্লেখিত সম্মেলন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নাই—আঃ মতিন)। তখন আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আপনারা এই মহৎ কর্তব্যে এগিয়ে আসুন। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিন বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে পাকিস্তানের কত অনিষ্ট করা হবে। আমরা পাকিস্তানের অনিষ্ট চাই না তাই বারো অনিষ্ট করতে চায় তারা যাতে মিথ্যা প্ররোচনা ও ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে তা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং তা করা তখনই সম্ভব যখন আমরা

সংগঠিত হবো। আজ সংগঠনের আশা প্রয়োজন। স্থানীয় এলাকা সংগঠন করুন ও স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করুন।’

“উপর্যুক্ত সাংগঠনিক ভিত্তি ব্যতীত ভাষা আন্দোলনকে যে শক্তিশালী এবং জয়যুক্ত করা সম্ভব নয় এই উপলব্ধি থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম পরিষদ উপরোক্ত প্রস্তাব (প্রচারপত্র—আঃ মতিন) গ্রহণ (বিল—আঃ মতিন) করেন।” (‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি—বদরুদ্দীন ওমর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬—১৪৩)।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষার বিষয়কে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের বিষয়টাই প্রধান বা একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতি তথা জাতিসত্তার বিষয় হল রাষ্ট্রের বিষয়। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়েছিল। রাষ্ট্রটা ছিল বুরজোয়াদের ও সামন্তদের। পাকিস্তান দাবী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর পরই পাকিস্তানের শাসকরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে রাষ্ট্র থেকে তথা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠরা ছিল একটা জাতি এবং দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের একটি অঞ্চলের অধিবাসী। সেই জাতির জাতিসত্তার মূল বিষয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করার অর্থ সেই জাতিকে রাষ্ট্র থেকে বাদ দেওয়া। এই রকম পরিস্থিতিতে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিণত হয় একটা জাতীয় কর্তব্যে অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রশ্নে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রাম।

যখন জাতির এক বা একাধিক দাবী জাতীয় বিষয়ে, অর্থাৎ জাতির অস্তিত্বের বিষয়ে পরিণত হয় তখন যে রাষ্ট্রে এই অবস্থা সৃষ্টি হয় সে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের মাধ্যমেই কেবল সে সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৭ এর শেষ দিক থেকেই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী বা নাগরিক জাতীয় ভিত্তিতে তাদের মাতৃভাষাকে সেই রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করছিল। এর অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ধর্মের ভিত্তির পরিবর্তে জাতিসত্তার ভিত্তিতে তাদের ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করেছিল। সুতরাং ঐ অবস্থায় সমাধান সম্ভব ছিল কেবল মাত্র সেই রাষ্ট্রের পূর্বের ভিত্তিকে বাদ দিয়ে নতুন ভিত্তি অবলম্বনের মাধ্যমে। এতে যদি শাসকরা সম্মত না হয় অর্থাৎ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে তাহলে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত না করা পর্যন্ত সেই জাতির আর

গত্যন্তর থাকে না। এটা দুই ভাবে হতে পারত—১) পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের অণ্ডলে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ২) শাসক শ্রেণীর তরফ থেকে রাষ্ট্রের ধর্মের ভিত্তিকে বাদ দিয়ে সেই জাতির জাতি-মন্তার ভিত্তিকে অবলম্বন করে ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে।

অর্থাৎ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবীর ব্যাপার বাস্তবে হয়ে দাঁড়াল পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের ব্যাপার। কারণ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীসম্পন্ন জাতিটি তাদের ভাষাকে শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি, এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর জন্য শেষ অবধি সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি সমগ্র জাতির তরফ থেকে শাসকগোষ্ঠীকে এই কথাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল।

এই জাতি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মূল সমর্থক ও প্রধান উপাদান। সেই ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জনের পর তাদের তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাদ দেওয়ার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তারা বদ্বর্তে পেরেছিল যে রাষ্ট্রের ভিত্তি পরিবর্তন ব্যতিরেকে তারা তাদের ভাষাকে ঐ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা রূপে পেতে পারে না। তাই তারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবী করার পর ভাষার জন্য সংগ্রাম করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সুতরাং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আন্দোলন প্রকারান্তরে হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের ভিত্তি পরিবর্তনের তথা রাষ্ট্র পুনর্গঠনের আন্দোলন।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন যত ব্যাপক, তীব্র ও আপোষহীন হতে থাকল এবং শাসকগোষ্ঠী যত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করার জন্য বিভিন্ন যড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন করতে থাকল তত বাঙ্গালী জাতিসত্তা ও শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্বও তীব্র হতে থাকল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বাংলা ভাষার আন্দোলনকে তুলে ধরে, লুপ্ত প্রায় অবস্থা থেকে সুমহান স্তরে উন্নিত করে রাষ্ট্রের সাথে জাতির দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে শাসক শ্রেণীর সংকটকে প্রকট ও সর্বব্যাপী করে তুলেছিল। সংকটে জর্জরিত, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও দিকৃত হয়ে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ধর্মের দোহাই, পাকিস্তানের ঐক্যের জিগির, প্রাদেশিক সরকারের প্রতিশ্রুতি, কেন্দ্রীয় সরকারের ও সকল নেতার প্রচেষ্টা

ও পরে তাদের মূক ও বধিরের ভূমিকা গ্রহণ, আরবী হরফের যাদু মন্তব্যবহারের প্রচেষ্টা ইত্যাদি যাবতীয় কিছু, প্রতারণা জাতির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলনের প্রবল স্রোতে যতই খড়কুটার মত ভেসে যেতে থাকল ততই শাসকগোষ্ঠি দিশাহারা হয়ে পড়তে লাগল। তাদের সংকট শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বাঙ্গালী জাতির কাছে যিনি হাস্যপদ, অপরিচিত, ন্যূনতম মাত্রায় সম্মানিত, প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মর্যাদাহীন ও নিদারুণভাবে ক্ষমতাহীন এহেন সরল, শরীফ ও অনেকটা নিবোধ ব্যক্তিটিকেই শাসক ও আমলাগোষ্ঠি এবার নির্বাচন করল রাজনীতির জটিলতম ও সূক্ষ্মতম এবং তাদের শাসনের অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত মত প্রকাশের মুখপাত্র হিসাবে। চার বছর আগে পাকিস্তানের প্রগটা হিসাবে সম্মানিত, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বলে খ্যাত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটি যে কথাটি বলার জন্য বাঙ্গালী জাতির কাছে চিরতরে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন সেই কথাটি প্রধানমন্ত্রী বলে কথিত খাজা নাজিমউদ্দিন নামক ব্যক্তিটিকে দিয়ে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিয়ে শাসকগোষ্ঠি তাদের সংকটের ষোলকলা পূর্ণ করল। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবলমাত্র উর্দু' এই কথাটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে পাকিস্তানের ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রের পট পরিবর্তন হয়ে গেল, সূচনা হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের। জাতি সমস্যা তথা জাতিসত্তা এমনই একটা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যা এড়িয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ নির্ভর কোনো বুদ্ধিজীবী শাসকগোষ্ঠি বা মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির পক্ষেও সম্ভব না।

আন্দোলনের নতুন স্তর ও ২১শে ফেব্রুয়ারী

বাংলাভাষার আন্দোলনের বিকাশের ফলে শাসকগোষ্ঠির রাজনৈতিক সংকট ঘণীভূত হয়ে অবশেষে ফেটে পড়ল শাসকগোষ্ঠির বিশ্বস্ত আঙ্গাবহ মেরুদণ্ডহীন ক্রীড়নক নামকাওয়াস্তে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের ২৭ জানুয়ারী, ১৯৫২ তারিখের পল্টনের জনসভায় ভাষণের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানের প্রগটা 'কারেন্দে আজম' মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর দোহাই দিয়ে ঘোষণা করলেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবলমাত্র উর্দু। তার এ ঘোষণা ছিল শাসকগোষ্ঠির সিদ্ধান্তমূলক নির্দেশ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খাজা নাজিমউদ্দিন কেবল সে সিদ্ধান্ত পল্টনের জনসভায় পাঠ করেছিলেন। এ প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্বে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন, এমন কি পূর্বে পাকিস্তানে কেন্দ্রের প্রধান প্রতিনিধি চীফ

সেক্রেটারী আজিজ আহমেদও না কি পূর্বাচ্ছে কিছ্, জানতেন না। সেই মূহুর্তে তাঁদের ঐ সিদ্ধান্ত বা ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত জানা না জানাটা কোনো বড় কথা না। বাস্তবে তারা একই দলের পান্ডা, একই রাজ-নৈতিক মতাদর্শের অনুসারী।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের এই ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি সে ঘোষণার বক্তব্যের প্রতিবাদে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ৩০শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে ধর্মঘট আহ্বান করল। ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে প্রতিবাদ সভাশেষে শহরে বিরাট মিছিলের মাধ্যমে জনগণকে তাদের মতামত জানিয়ে দিল।

এদিন “সভা শেষে যখন মিছিল বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মী ও নেতারা মিছিলের বিরোধিতা করেন। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐ দিন মিছিল বের হয়।.....মিছিলের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির (ওমর সাহেব তাঁর বইতে কোথাও ‘সংগ্রাম পরিষদ, কোথাও ‘সংগ্রাম কমিটি’ লিখেছেন—আঃ মতিন) পক্ষ থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৫২—আঃ মতিন) সমগ্র ঢাকা শহরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়।” (পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি—বদরুদ্দীন ওমর, ৩য় খণ্ড পৃঃ—২২২)

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ১৯৪৮ সালে মার্চ মাসের ৪ বছর পর ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫২ তে ঢাকায় এই প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল। যারা মনে করেছিলেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার জন্য আর আন্দোলন হয়তো হবে না, ৩০শে জানুয়ারীর ধর্মঘট ও বিশাল মিছিল তাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় ও প্রেরনার ব্যাপার ছিল।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ভাষা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করলেও ১৯৪৮ সালের পর ঐ সংগঠন ভাষা আন্দোলনে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাই। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও ইতিমধ্যে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বমূলক বা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাই। ১৯৪৮ সালে বাম হঠকারী লাইনের কারণে বিপর্যস্ত হওয়ার এবং রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার দরুণে কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বমূলক

ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় নি। কমিউনিস্ট পার্টি তত্ত্বগতভাবে জাতি সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেও বাস্তবে ঐ সমস্যার রূপ কি এবং তার সমাধান কি তা কেবল ঐ সময়কার কমিউনিস্ট পার্টি না পরবর্তীকালে ঐ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আলাদা হওয়া কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ও জাতি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে নি।

এই কারণে ১৯৫০ সালে বাংলা ভাষার দাবীতে ছাত্র লীগ, আওয়ামী লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কিত বা সংগঠনভুক্ত নয় এমন সাধারণ ছাত্রদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রথম দিকে পূর্বোল্লিখিত সংগঠনগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে মোটেই সহযোগিতা করে নাই। হয় ঐ সংগঠনগুলি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আবার আন্দোলন হতে পারে মনে করতেন না কিংবা ভাষা যে জাতির প্রধান বিষয়, জাতিসত্তার মূল উপাদান এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতি যে তাদের ভাষার দাবী ছাড়তে পারে না এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে তারা বাংলা ভাষার জন্য এমন আন্দোলন করতে সক্ষম যার কাছে জাতি বিরোধী হেতু গণবিচ্ছিন্ন শাসক শ্রেণী মাথানত করতে বাধ্য তা বিশ্বাস করতেন না।

অথচ বাংলা ভাষার দাবীতে আন্দোলন হতে পারে এবং সে দাবী যেহেতু জাতিরও আকাঙ্ক্ষা সেই কারণে সমগ্র জাতি আন্দোলনে সামিল হবে এবং সে আন্দোলনের কাছে জাতি বিরোধী হেতু গণবিচ্ছিন্ন শাসক শ্রেণী মাথা নত করতে বাধ্য এই মূল্যায়নের ও রাজনীতির ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি শূণ্যের পর্যায় থেকে ভাষা আন্দোলনকে সমগ্র জাতির সক্রিয়ভাবে সমর্থিত আন্দোলনে পরিণত করার পথে আস্থা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ধীর ও সৃষ্টিশীলভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৫০ সালের মার্চের পর থেকে ধাপে ধাপে আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিল। এই কমিটি ১৯৫০ সালের এপ্রিল বা মে মাসে সীমাবদ্ধ আকারে পতাকা দিবস পালনের মাধ্যমে যেমন বাংলা ভাষার দাবীর কথা নতুনভাবে তুলে ধরেছিল তেমনি জনগণের কাছে আর্থিক সহায়তার আহ্বান জানিয়ে একদিকে পরবর্তী কার্যক্রম পালনের জন্য সংগঠনকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে, অন্যদিকে জনগণকে সক্রিয় কার্যক্রমে সামিল করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর ১৯৫১ সালে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন উদ্যম ও

দৃষ্টিভঙ্গিতে ১১ই মার্চ পালনের জন্য প্রচারপত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়ে ১১ই মার্চ বার্ষিকী দিবসকে সংগঠিত করেছিল। এই ভাবে ১১ই মার্চ পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজ অতীত ভাষা আন্দোলনকে (১৯৪৮ মার্চের) বর্তমান (১৯৫১ মার্চের) ও ভবিষ্যৎ (১৯৫২ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর) ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিতভাবে উপলব্ধি করার ভিত্তি পেয়েছিল। এরপর ঐ বছরই এপ্রিল মাসে কমিটি গণপরিষদের সদস্যদের কাছে নামে নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ও যুক্তিতে এক স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল। স্মারকলিপির বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যথা-স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা ছুটির অবকাশে তাদের নিজ নিজ স্থানে ছাত্র ও জনগণকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে সচেতন ও সংগঠিত করতে পারে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে তাদের হাতে দিত, এবং তাদের সংগঠিত করত। এই সব উপায়ে ভাষা আন্দোলনকে ধাপে ধাপে প্রসারিত করা ও এগিয়ে নেওয়ার এক পথিয়ে ১৯৫২ সালের ২৭ শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের কেবল উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ২৯ শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে ৩০ শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘটের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে কমিটি সভাশেষে মিছিলের প্রস্তাব করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে এতবড় মিছিল ইতিপূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় নি। মিছিলকে জনগণ বিপুলভাবে সমর্থন জানায়। মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছাত্রসভায় বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকার সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘট ও মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তৃতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত পরিধর্মঘট এবং তার সাথে মিছিল সংগঠিত করে ছাত্র ও জনগণকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। এতে দুটো ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব ঘটে। একটা হল, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের তথা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচন্ড সংকট সৃষ্টি, আর একটা হল, এ যাবত ভাষা আন্দোলনে প্রকৃত অর্থে নিষ্কয় থাকা ছাত্র লীগ, আওয়ামী লীগ ও কমিনিষ্ট পার্টির মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও তাদের ভাষা আন্দোলনে অনুপ্রবেশ।

২৭শে জানুয়ারী ১৯৫১ পলটনে খাজা নাজিমউদ্দিনের 'কেবলমাত্র উদ্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণার পর মদুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় অনেকে এই বক্তব্যকে অসময়োচিত ও অহেতুক বলে মূল্যায়ন করেন এবং অনেকে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতির কথা বলেন।

“পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গা সফরের পর ৩রা ফেব্রুয়ারী নাজিমউদ্দিন ঢাকায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, তিনি পলটন বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তার নিজস্ব কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। তিনি কায়েদে আজমের মতই প্রকাশ করেছিলেন। তবে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পাকিস্তান গণপরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। নাজিমউদ্দিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন যে, ‘রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আমার বক্তৃতাকে এমনভাবে মোচড় দেওয়া হয়েছে যাতে মনে হয়েছে যে, সেটা আমার নিজেরই মতের অভিব্যক্তি। এটাকে ঘটনার বিকৃতি বলেই আমার মনে হয়।’ ” (‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’—বদরুদ্দীন উমর, ওয় খন্ড, পৃঃ ২১৯)

এ কিসের আলামত? জনগণের মধ্যে কতখানি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে এবং শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে কতখানি সংকটের সৃষ্টি হলে ২৭শে জানুয়ারী প্রকাশ্য জনসভায় একটা বক্তব্য ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে একজন প্রধান-মন্ত্রীকে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই রকম কথা বলতে হয় তা সহজেই অনুমেয়।

এর তিন দিন পর “৬ই ফেব্রুয়ারী পাজাব থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্য চৌধুরী নাজির আহমেদ খান নাজিমউদ্দিনের উক্তির প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে বলেন,

‘একটি রিপোর্ট’ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়ে সংবিধান সভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই বক্তব্য টেকনিক্যাল দিক দিয়ে সঠিক হতে পারে কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রী একথা বলেছেন সেজন্য এর থেকে এই বিপদ ঘটতে পারে যে, যারা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতার কারণে আমাদের জাতীয় ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায় তারা একে ভুল বুঝতে পারে এবং এর অপব্যবহার করতে পারে। উদ্দুই যে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষারূপে প্রত্যেক সরকারী মুদ্রাপত্র এবং দায়িত্বশীল নেতার দ্বারা পাকিস্তানের প্রথম থেকেই স্বীকৃত হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

খাজা সাহেবের বিবৃতির প্রতিবাদ খুবই প্রয়োজন অন্যথায় আমি আশঙ্কা করি যে, এর ফলে বিতর্ক ও তিস্ততার সিংহদ্বার খুলে যাবে, যার পরিণতি দাঁড়াবে খুব খারাপ।” (ঐ, পৃঃ ২০২-০৩)

এতেই অনুমান করা যায়, ভাষা আন্দোলনের ফলে ঐ সময় শাসক-গোষ্ঠির সংকট কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

অন্যদিকে ১৯৪৮-এর পূর্ব ভাষা আন্দোলনে এতদিন নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চুপ ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টিও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

২৭ শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের ‘কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ এই ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ২৯শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা, ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ও মিছিল অনুষ্ঠানের আহ্বান জানায়। ৩০ শে জানুয়ারীর মিছিল বাংলা ভাষার জন্য ইতিপূর্বের যে কোনো মিছিলের কেবল সমতুল্যই ছিল না, সে মিছিলের প্রতি ছিল জনগণের প্রবল সহানুভূতি ও বিপুল সমর্থন।

২৯ শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি আহৃত প্রতিবাদ সভার পর “ঐ দিনই পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ যুব লীগের পক্ষ থেকে নাজিম-উদ্দিনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন।”.....ঐ বিবৃতিতে জনাব অলি আহাদ আরো বলেন, “আমরা আমাদের সকল ইউনিটকে বিশেষভাবে এবং জনগণকে সাধারণভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যাতে তাঁরা এর নিন্দা করেন। আমরা এই সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রতি যাতে তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।” (পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি-বদরুদ্দীন উমর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২০-২১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ গঠিত হওয়ার পর থেকেই ভাষা আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। এ বিষয়ে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫১ খাজা নাজিমউদ্দিনের উর্দুর স্বপক্ষে তথা বাংলা ভাষার বিপক্ষে ভাষণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিই

সে বক্তবোর বিরুদ্ধে ঢাকায় সর্বস্তরের ছাত্রদের সভা, মিছিল ইত্যাদি সংগঠিত করে জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করে তুলেছিল। ঐ কর্মিটি যখন এইভাবে নতুন পরিস্থিতিতে ভাষা আন্দোলনকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল তখন হঠাৎ ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৫২ তারিখে সকল দলমতের লোকদের এক সভা আহ্বান করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগ। অবশ্য, এই রমক একটা সভা আহ্বান করার চিন্তা তারা পেয়েছিলেন যুবলীগের কাছ থেকে। এই সভায় প্রায় সকল দলমতের লোকেরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সভায় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

কি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেছিল তা বদরুদ্দীন উমর সাহেবের বহু উদ্ধৃত বইর ৩য় খন্ডের ২২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মোহাম্মদ তোয়াহার কথা থেকে অনেকটা বোঝা যায় :

“.....তোয়াহা আমার সঙ্গে সাক্ষাতকারের সময় (২৯. ৬. ৬৮) বলেন, বার লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি ভর্তি লোকজন। যদিও কথা ছিল প্রত্যেক দলের থেকে দুই একজন থাকবে। কিন্তু দেখা গেলো প্রায় ৫০টা ছোটখাট সংগঠনেরও প্রতিনিধি হাজির। এর অর্থ হলো, যুবলীগকে সংখ্যালঘু করে দেওয়া। এ বিষয়ে কাজী গোলাম মাহবুব জেলে আমাকে বলেছিল যে মেজরিটি দিয়ে আমাদের cowed down করার চেষ্টা তারা করেছিলো। আমরা কিন্তু এত confident ছিলাম যে, সে রকম কোন ব্যবস্থা করিনি। আওয়ামী লীগের পক্ষে এই কাজ করে খোন্দকার মদুশতাক আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নওয়াজ খান, আউয়াল এবং ওদুদ। মিটিং-এ কনভেনারের প্রশ্ন যখন উঠলো আমরা আমাদের candidate দেওয়ার কথা তুলতেই পারলাম না। কারণ মাইনিটি। কাজেই কাজী গোলাম মাহবুব কনভেনর।”

যারা ৪টি বৎসর ভাষার জন্য কোনো আন্দোলন করেন নাই, তার জন্য কোনো ভূমিকা পালন করেন নাই তারা ৩০ শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ধর্মঘট ও মিছিলের সফলতা ও সাধারণ মানুষের খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তৃতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে যুব লীগের প্রস্তাবে ভাষা আন্দোলনে তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসাবে এই সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে সর্বদলীয় একটা কর্মিটি গঠন করেছিলেন।

তড়িঘড়ি তাদের কমিটি তথা পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলনের চেয়ে নেতৃত্বই প্রধান ছিল তা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন এই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পরবর্তী কার্যাবলীই প্রমাণ করে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর উক্তির প্রতিবাদে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অভূতপূর্ব ধর্মঘট বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার ছাত্রের উৎসাহদীপ্ত সমাবেশ এবং ১০/১৫ হাজার ছাত্র জনতার বাংলার দাবী উচ্চারিত আকাশ প্রকম্পিত কন্ঠের মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বিশেষ ভূমিকা বা অবদান ছিল না।

ছাত্র জনতার বিশাল মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাপ্তি সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিই ২১ শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন শুরুর হওয়ার দিনে দেশব্যাপী হরতাল, ছাত্র ধর্মঘট এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারীই মিছিলসহ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে উপস্থিত হয়ে পরিষদের সদস্যদের কাছে পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করার কর্মসূচী উপস্থিত করেছিল।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীকে অবশ্য অনুমোদন করেছিল। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে সবচেয়ে সংগঠিত শক্তি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এবং পূর্ব পাকিস্তান যুবদল। ৩১শে জানুয়ারী সর্বদলীয় কর্মসভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারী উদ্ঘাপনের কোনো কর্মসূচী ছিল না। অবশ্য ঐ কর্মসভায় ৩ নং প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঘোষিত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীর প্রতি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছিল।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গৃহীত ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিষদ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীকে সমর্থন করলেও সে কর্মসূচী পালনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কেবল এক বিবৃতির মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়েছিল এবং ১১-১২ ফেব্রুয়ারী অর্থ সংগ্রহের জন্য পতাকা দিবস ঘোষণা করেছিল। সে পতাকা দিবসও উদ্যোগী ভূমিকার অভাবে সম্ভাবনা সত্ত্বেও তেমন সাফল্যমন্ডিত হয় নাই।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছাত্রদের ধর্মঘট ও মিছিলের পর (৪ঠা ফেব্রুয়ারী কেবল ঢাকায় নয়, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি জেলায় একই ব্যাপার ঘটেছিল) পূর্ব ঘোষিত ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীর জন্য আন্দোলন যত এগিয়ে যেতে থাকে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তত সংকট এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের মধ্যে দোদুল্যমানতা তত বাড়তে থাকে। আন্দোলন যত বাড়তে থাকে আন্দোলনের ভয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তত সংকুচিত এবং নেতৃত্ব প্রদানে উদ্যোগহীন হতে থাকে।

তারপর, ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় যখন সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ঘোষণা করে তখন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বের ১৪৪ ধারার দরদুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মূচ্ছা যাওয়ার অবস্থা। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য পার্টির এবং যুব লীগের মোহাম্মদ তোয়াহাসহ ১১ জন সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করা তথা সরকারের নিষেধাজ্ঞা মেনে নেওয়ার পক্ষে মত দিয়ে ভাষা আন্দোলনকে ২০শে ফেব্রুয়ারীতেই শেষ করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তারা তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গন্ডীবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের ওপর রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং বাস্তবত ভাষাকে জাতিসত্তার প্রধান উপাদান হিসাবে না দেখতে পারার কারণে যে জনগণ সংগ্রাম করবে তাদের দেখতে অপারগ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিও ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু আন্দোলনের বিকাশমান দুর্বীর গতিধারাকে ভিন্নধাতে প্রবাহিত করার কর্মধারাকে প্রতিহত করার শক্তি, সদস্য সংখ্যা হিসাবে কম হলেও, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে ছিল। এই শক্তি হল আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুব লীগের একাংশ ও কমিউনিস্ট পার্টির ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত বিরোধী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, যুবলীগের একাংশ ও তমদ্দুন মজলিস। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে এদের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যায় মাত্র ৪ জন হলেও ব্যাপক ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা, আকাংক্ষা ও মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করত সংখ্যালঘিষ্ঠ এই ৪ জন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ১১ জন না।

ভাষা আন্দোলনে সংগঠিত ও ব্যাপক সাধারণ ছাত্র সমর্থিত শক্তি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ও অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন যুবলীগ। এই দুই সংগঠিত শক্তির প্রতিনিধিগণ সর্বদলীয় সংগ্রাম

পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের সমাবেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু উভয় মত উপস্থাপিত করা হবে এবং সেখানকার মতামতই হবে চূড়ান্ত।

সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এই কারণে যে তাদের এ ছাড়া উপায় ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ এই ক্ষীণ আশা ও ভরসায় যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্ররা হয়তো ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পরিণামের কথা বিবেচনা করে তাদের (সংখ্যাগরিষ্ঠের) ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার মতামত তথা প্রস্তাবটি মেনেও নিতে পারে।

জাতির ইচ্ছা আকণ্ঠা ও মনোভাবের সেই সময়কার ঐতিহাসিক প্রতিনিধি যে ছাত্র সমাজ তাদের অবশ্যম্ভাবী ভূমিকা সম্পর্কে সংগ্রাম পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্যক ধারণা ছিল না। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ফলশ্রুতি-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দায়দায়িত্ব এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বিলুপ্তি ঘটবে এই মর্মে একটা প্রস্তাবও পাশ করিয়ে নিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য সামসুল হককে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছাত্র সমাবেশে উপস্থাপিত করার মুখপাত্র মনোনীত করেছিল।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা এবং না করা এই দুইটি মত ছিল দুইটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন। যারা (আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ, যুবলীগের একাংশ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ) ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধী ছিলেন তারা বুঝেছিলেন যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে ভাষা আন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত হবে এবং সে আন্দোলনকে শাসকগোষ্ঠীর পরাজয় পর্যন্ত চালিয়ে নিতে হবে। শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ ছিল। তারা মনে করতেন শাসকগোষ্ঠী এত শক্তিশালী যে তাদের পরাজিত করা অর্থাৎ তাদের দিয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করানো কখনই সম্ভব না।

সুতরাং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে এ রকম একটা আন্দোলনের সূচনা করার চেয়ে সরকারের ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা মেনে আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে সরকার ভবিষ্যতে যে নির্বাচনের কথা বলছে বা সরকার আজ হোক কাল হোক যে নির্বাচন দিতে বাধ্য সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ক'রে নিয়মতান্ত্রিক পথে ধাপে ধাপে রাজনীতিকে এগিয়ে নেওয়াই বাস্তবসম্মত ও বুদ্ধিমানের কাজ হবে এই মত পোষণ করতো ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পথাবলম্বীরা।

এ ছাড়া ভাষার ব্যাপারকে তাঁরা একটা মামূলি বা সাধারণ রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে দেখতেন। ভাষা যে একটা জাতিসত্তার মূল বিষয় এবং জাতির সত্তার বিষয়, জাতির অস্তিত্বের ব্যাপার, এবং এই কারণে জাতির একটি চরম ও পরম ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার এইভাবে তারা ভাষার জন্য আন্দোলনকে তথা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে দেখতেন না। তারা ভাষার জন্য আন্দোলনকে মর্দুটিমের লোকের 'অর্থহীন' আন্দোলন হিসেবে দেখতেন, সে আন্দোলনকে একটি জাতির অত্যাবশ্যিক আন্দোলন হিসেবে দেখতেন না। এই কারণে ভাষার জন্য আন্দোলনের কোন সার্থকতা বা ভবিষ্যত তারা দেখতে পেতেন না। এই কারণে ভাষার জন্য আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কোনো কারণও তাঁরা দেখেন না। তাই তারা ছিলেন ১৪৪ ধারা ভংগ করার ঘোরতর বিরোধী এবং ১৪৪ ধারা ভংগ করাতে ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত।

এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার লোকরাই ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে এত জন-সমর্থন জয়লাভ করেও রাজনীতির কোনো ফয়সালা করতে পারেন নি, এমন কি ১৯৭১ সালে জাতির সশস্ত্র সমর্থনে জাতিসত্তার ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র-গঠন করেও জাতির সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেন নি। এ ধরনের চিন্তা-ধারার অনুসারীরা যেমন আজও কোনো রাজনৈতিক সমাধান দিতে পারছেন না এই রকম চিন্তা-ভাবনার বশবর্তী থাকলে ভবিষ্যতেও তেমনি পারবেন না।

অথচ দেখা যাচ্ছে একটা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দৃঢ়ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হলে একের পর এক যা যা ঘটবে ২১ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্ব ও সাধারণ ছাত্রদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে তাই ঘটতে থাকল। পূর্ব ঘোষণার কারণে আরোপিত ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা সত্ত্বেও ১৫-২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী

২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে ঠিকই জমায়েত হয়েছিল। এটাও ছিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কল্পনার বাইরে অনভিপ্রেত ঘটনা।

জাতির সেনাবাহিনীর লক্ষ ভাগেরও কম এবং তাও ছাত্র ডিভিশনের মাত্র এক প্ল্যাটুনের মত সৈন্য সেদিন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধী শাসক শ্রেণীকে মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে সমবেত হয়েছিল। এ সমাবেশ যদি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হত এবং তাদের কামাই হত তাহলে ঐ দিনের (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২) লড়াইতে সমবেত সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে (সংগঠিত সমবেত ছাত্রদের) সেনাপতিমন্ডলী হিসাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ শত্রুর হাতে অস্ত্র জমা দিয়ে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা মেনে নিয়ে ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ দিতে পারত না।

বহু বৎসর পূর্বে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রাংগণে স্বাধীনতর সেনাবাহিনীর অস্ত্র ব্যবহার না করার পরিণতি যা হয়েছিল এই দিনও তাই হত। সেদিন মীরমদন মোহনলালদের নির্দেশ মীরজাফর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ মানে নাই। কিন্তু এই দিন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২) সমগ্র সেনাবাহিনী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ও অন্যান্য সেনাপতির নির্দেশে পরিচালিত হওয়ার জন্য ১৭৫৭ সালের রণাঙ্গনের পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই।

২১শে ফেব্রুয়ারী সমবেত ছাত্রছাত্রীরা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেই কেবল একুশের যাত্রা শুরু করতে ও দশ জনের কাতারে কাতারে পুলিশের শেল বর্ষণ ও বেটন নী ভেদ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণ থেকে রাস্তায় অবতীর্ণ হতে পেরেছিল।

যাত্রা শুরু করে পাইকারি ধর পাকড়, নিম্ন লাঠি চার্জ ও অবিগ্রাস্ত শেল বর্ষণের ঘনঘটার মধ্য দিয়ে অকুতোভয় ছাত্র মিছিল এগুতে থাকল এবং আশু লক্ষাস্থল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাংগণ (বর্তমানে যেখানে শহীদ মিনার) জমায়েত হতে থাকল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণ থেকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এইটুকু পথ অতিক্রম করতে মিছিলের প্রায় দুই ঘন্টা সময় লেগেছিল। শত সহস্র পুলিশের সর্বপ্রকার উপায়ে বাধাদানের প্রচেষ্টা

সত্ত্বেও মিছিল ছত্রভংগ হয়ে বা অন্য কোনো পথ ঘুরে মিছিল আশু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায় নাই, মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নির্দেশিত পথ ধরেই আশু লক্ষ্যস্থলে (মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাংগণে) উপনীত হয়েছিল। মিছিলের এই অপূর্ব দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলাবোধ বিশাল রাষ্ট্রীয় রক্ষী বাহিনীকে কেবল হতবাকই করে নাই, তাদের মনোবলকেও ভেংগে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা এই ভাবেই অর্জন করেছিল।

এরপর সংগঠিত মিছিলের ভিত্তিতে ছাত্রদের মূল লক্ষ্যস্থান ছিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে (শাসক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফলতি প্রসূত হত্যাকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র বর্তমান জগন্নাথ হলের এসেম্বলী হল) পৌঁছার কর্মসূচী। জনগণকে পূর্বাহেই এ কর্মসূচী জানিয়ে দেওয়া ছিল। সুতরাং সরকারও এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিল। সরকার এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত হতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাংগণে (বর্তমানে যেখানে শহীদ মিনার) গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিল। গুলি বর্ষণে ঘটনাস্থলেই রফিক উদ্দিন সালাউদ্দিন ও জুব্বার নিহত হল, বরকত সহ বহু ছাত্র আহত হল। বরকত হাসপাতালে রাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তখন ঐ মূহুর্তের করণীয় দাঁড়াল অসংখ্য গুলিবিদ্ধ আহতদের দ্রুত হোস্টেল সংলগ্ন মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। ভাষার জন্য আন্দোলনকারী নিরীহ ছাত্রদের ওপর পৈশাচিক ও বর্বরোচিত গুলি বর্ষণের ও তাতে অসংখ্য ছাত্রের নিহত ও আহত হওয়ার সংবাদ বিদ্যুৎবেগে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার মানুষ সব ফেলে ঘটনাস্থল ও মেডিক্যাল কলেজে ছুটে আসতে লাগল। সব দেখে শুনে তারা ক্রোধ, ঘৃণা ও বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। শীতের ছোট দিনটা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল। ছাত্ররা করণীয় হিসাবে পরের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী হরতাল এবং ঢাকার হরতাল ও ঘটনাস্থলে গায়েবী জানাজার কর্মসূচী ঘোষণার জন্য নেতৃত্বের কাছে ছুটে গেল।

এত রক্ত, এত মৃত্যু, এত আহত দেখে আমার মনে হচ্ছিল, আমিই এ সবেব জন্য দায়ী। এই মানসিক অবস্থায় মৃত ও আহতদের কাছে থাকতে না পেরে মেডিক্যাল কলেজের সামনের লেনে একাকী বসে ছিলাম; আমার চোখ ফেটে পানি আসছিল। এমন সময় ভাষা আন্দোলনের হাজার হাজার বীর সৈনিকদের অন্যতম, ছোট-খাটো চেহারার সান্তার আমাকে

লনে বসে থাকতে দেখে আমার কাছে এগিয়ে আসল। সে বলল, আপনি কাদছেন! কেঁদে তো আর ওদের ফিরে পাওয়া যাবে না। আমি আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি। এ ভাবে বসে না থেকে কাল কি করা যায় সেটা ঠিক করেন। আমি বললাম, আমি ঠিক বুঝছি না এখন কি করতে হবে। সান্তার বলল, মানুষের যে রকম সহানুভূতি দেখছি তাতে কালকে গায়েবী জানাজা ও হরতালের ডাক দিলে জনগণের ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাবে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এই রকম একটা আহ্বান জানালে কাজ হবে। আপনি মাহবুব ভাইকে এই মর্মে তাড়াতাড়ি একটা লিফলেট লিখে তাতে সই দিতে বলুন। দু'এক ঘণ্টার মধ্যে হাজার কয়েক লিফলেট ছাপাতে পারলে এবং মসজিদে মসজিদে ও শহরের মোড়গুলিতে দু'চার কথা বলে সেগুলি বিলি করতে পারলে, এবং নীলক্ষেত, পলাশী আজিমপুরে কিছু লিফলেট দিতে পারলে শহরে মোটামুটি প্রচার হয়ে যাবে। কিছুটা রাত হলেও হল, হোস্টেল ও মেসগুলিতে লিফলেট বিলি করতে হবে। তাহলে ছাত্ররাও মোটামুটি কালকের কর্মসূচী জানতে পারবে।

আমার কাছে কথাগুলি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত মনে হল। বললাম, মাহবুব তো ইমারজেন্সিতে আহতদের দেখাশোনা করছে। যা বললেন সংক্ষেপে সেইগুলি তাড়াতাড়ি লিখে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই আছি। আমি মাহবুবের সইর ব্যবস্থা করব।

সান্তার দ্রুতগতিতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে চলে গেল। মেডিক্যাল কলেজের এই হোস্টেলটা ছিল ভাষা আন্দোলনের একটা ঘাঁটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সান্তার লিফলেটের খসড়া নিয়ে উপস্থিত হল। আমি সান্তার ও তার সঙ্গে ছেলেদের অপেক্ষা করতে বলে মাহবুবের অর্থাৎ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুবের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

মাহবুব ইমারজেন্সীতেই ছিল। সকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা, কি না করা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ডের পর এই তার সাথে দেখা ও কথা। তাকে একটু ফাঁকে ডেকে আহতদের প্রাথমিক খোঁজ-খবর নিয়ে বললাম, যা হবার হয়েছে এখন প্রয়োজন কালকের কর্মসূচী দু'এক ঘণ্টার মধ্যে ছাপিয়ে রাতে এশার নামাজের পর মসজিদগুলিতে ও মেসগুলিতে এবং রাতে ব্যারাক, হল, হোস্টেল ও মেসগুলিতে কিছু কিছু বিলি করা। কালকের কর্মসূচী হবে ঘটনাস্থলে গায়েবী জানাজা এবং শহর সেক্রেটারিয়েট ও শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান গুলিতে ধর্মঘট ও হরতাল। জানাজা শেষে মৃতদেহগুলি নিয়ে শহরে হবে মিছিল। তুমি লিফলেটের খসড়ার আহ্বায়ক হিসেবে সইটা দিয়ে দাও।

আমার কথা শুনে মাহবুব ক্ষেপে উঠল। সে বলল, তোমরা চরম হঠকারী কাজ করেছ। তোমাদের জন্যই আজ এতগুলি ছেলেকে জীবন দিতে হল, অসংখ্য ছেলে আহত হল। তাদের মধ্যে আরো কয়েকজন মারা যাবে। এই সব ভেবে চিন্তেই তো আমরা ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার কথা বলেছিলাম। আমরা আর তোমাদের সাথে নেই।

তার কথায় আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললাম, দ্যাখো মাহবুব, বাজে বোকা না। বরং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্যই এ আন্দোলনের নতুন যাত্রা শুরু। তোমরা '৪৮ থেকে ১৪৪ ধারার ভয়ে পিছিয়ে থাকছ। আমরা যতদিন ১৪৪ ধারা মানবো ওরা ততদিন আমাদের ১৪৪ ধারার ভয় দেখাবে। দেখছ না হাজার হাজার মানুষ গুলির খবর শুনে ছাত্রদের দেখে যাচ্ছে; তাদের পূর্ণ সহানুভূতি ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি। কাল বিরাট হরতাল ও মিছিল হবে। এখনও সময় আছে। লিফলেটে সই দিয়ে দাও। তোমরা সই না দিলেও আন্দোলন বসে থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির নামে লিফলেট যাবে। তারপর তোমাদের কানাকড়ির মূল্য থাকবে না। আন্দোলন চলবেই, তখন তোমাদের এখানে ফেউ ফেউ করে ঘুরতে হবে, সরকারকে বাংলার দাবী মানতেই হবে।

আমার এত কথার পরও মাহবুব সই না দেওয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়কের সই দিয়ে প্রচারপত্র ছাপিয়ে সেই রাতেই মসজিদে মসজিদে, শহরে, হল ও ছাত্রাবাসগুলিতে এবং নীলক্ষেত ও পলাশীর বারাকগুলিতে সেগুলি বিলি করা হয়েছিল। কোথা থেকে কারা এই লিফলেটগুলি ছাপিয়েছিল তা জানার কাউর অরসর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

পরদিন সেক্রেটারিয়েট থেকে হাজার হাজার সরকারী কর্মচারী এবং শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ এবং ছাত্ররা দলে দলে গতদিনের গুলিবর্ষণের স্থান মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাংগণে জমায়েত হতে থাকে। ১০টার দিকে ২০/২৫ হাজার গোক গায়েবী জানাজা পড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে।

বিশাল মিছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার ও নূরুল আমিনের পদত্যাগের দাবীতে বঙ্গকন্ঠে আওয়াজ তুলে শহরের দিকে এগুতে থাকে। এত বিশাল, এত সুসংঘবদ্ধ, এত জঙ্গী এত সকল স্তরের মানুষের মিছিল ইতিপূর্বে ঢাকায় ও পাকিস্তানে হয় নাই। সেই মিছিল কার্জন হল ও হাই কোর্টের মাঝামাঝি পেঁছতেই তার ওপর পদলিখের গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। ৭) ঘটনা স্থলে হাই কোর্টের কর্মচারী রফিক নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হল। পেছনের দিকটা ছত্রভঙ্গ হলেও মিছিল এগিয়ে চলল। শহরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র জনতার মিছিল চলতে থাকল। নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল ও অপ্রতিহত ভাবে মিছিল চলল। সরকারী পত্রিকা 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা অফিস মিছিলের এক অংশ আক্রমণ করল। পদলিখের গুলি বর্ষণে মিছিলের একাংশ ছত্রভঙ্গ হলেও আবার মিছিলে পরিণত হয়ে এগুতে থাকল। জগন্নাথ কলেজ এলাকার ও পুরানো ঢাকার মিছিলও শহরের দিকে এগুতে থাকল। মিছিলগুলি সমবেতভাবে উদ্‌ ও গতদিনের গুলি বর্ষণের সমর্থক সরকারী দৈনিক পত্রিকা 'মনিং নিউজ' অফিস আক্রমণ করল ও তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ফায়ার ব্রিগেড বাহিনী এগিয়ে আসলে জনতা তাকে প্রতিহত করে মনিং নিউজ পত্রিকা অফিস ভাঙা ভেঙে হতে সহায়তা করল।

২১ শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের সূচিত আন্দোলন ২২ শে ফেব্রুয়ারী জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়ে সরকারী প্রতিরোধকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছিল। ২২ শে ফেব্রুয়ারী জনগণ সকল প্রকার প্রতিরোধকে প্রযুক্তি ক'রে সরকারী প্রশাসনকে অকেজো করে দিল। ২২ শে ফেব্রুয়ারী বিজয়ের ফলে জনগণের দুর্বীর মিছিলে সংগঠিত শক্তি সরকারী প্রশাসন শক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করল। জনগণের মিছিলে সংগঠিত শক্তির কাছে সরকার পশ্চাদপসরণ করে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। সরকার জনগণের প্রতিরোধ ও দাবীর কাছে পরাভূত হল, জনগণের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হল। জনগণের প্রতিরোধ ও আক্রমণের উত্তাল উত্থানে সরকারের সশস্ত্র বাহিনী পঙ্গু হয়ে গেল। সরকার দেশব্যাপী গণ অভ্যুত্থানে ভীত বিহ্বল ও ভূমিকাহীন হয়ে কয়েকদিনের জন্য অকেজো হয়ে থাকল।

২৭ শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলে সরকার শাসন পরিচালনার স্বাভাবিক কর্মকান্ডে ফিরে আসলেও কয়েক দিনের লড়াইয়ে রাষ্ট্র যে শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল ১৯৭১ সালে তার বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শাসক শ্রেণী সে রাষ্ট্রকে পূর্ব অবস্থায় আর ফিরিয়ে আনতে পারে নি। শাসক শ্রেণী দীর্ঘ দুই দশকব্যাপী তাদের রাষ্ট্রের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে

আনার জন্য ব্যবহার্য প্রকার কৌশল খাটিয়ে ও শক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৪৮ সালে নির্বাচন দিয়ে, নির্বাচনের পর কেন্দ্রের শাসন জারি করে; ১৯৫৫ সালে সে শাসন তুলে নিয়ে, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন কায়েম করে, ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্র দিয়ে, ১৯৬৯ সালে আবার সামরিক শাসন জারি করে, ১৯৭০ সালে আবার নির্বাচন দিয়ে, নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালে সশস্ত্র বাহিনী নামিয়ে সরাসরি জনগণের সাথে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে একেজো হওয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রকে শাসক শ্রেণী আর পূর্বে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এই খানেই নিহিত আছে ২১ ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের মহান তাৎপর্য।

২২শে ফেব্রুয়ারীর বিজয় গণ-অভ্যুত্থান না ঘটলে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ও প্রাণদান বিফল হয়ে যেত। আবার ২১শে ফেব্রুয়ারীর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ও অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রতিবাদ ও মিছিল না হলে এবং মিছিলে হঠকারী, অহেতুক গুলিবর্ষণ না হলে ২২শে ফেব্রুয়ারীর অভূতপূর্বে প্রতিরোধ ও গণ-অভ্যুত্থান হত না।

২২শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থানের ফলে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনকারীদের ওপর জুলুম, নির্যাতন ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ভাষার জন্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ অভ্যুত্থানে পরিণত হল। ভাষা জাতি সত্তার মূল উপাদান। জাতি ভাষার জন্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে ভাষার আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করল। ভাষার দাবীতে জাতি প্রথমে ঢাকা এবং সংগে সংগে দেশব্যাপী অভ্যুত্থান সংঘটিত করে বাংলা ভাষার দাবী এবং তার মাধ্যমে নিজের মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্বের আধিকার প্রতিষ্ঠিত করল।

আন্দোলনকারীরা ২৬শে ফেব্রুয়ারী হরতাল ও ধর্মঘট প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত, জনগণকে নিরস্ত হতে না বলা পর্যন্ত ঢাকা সহ দেশব্যাপী আন্দোলনের উত্তাপ অব্যাহত ছিল। প্রত্যাহার না করলেও আন্দোলনের গতি সীমিতই হয়ে আসতো। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে, আন্দোলনের জয় পরাজয়, আন্দোলনের সফলতা, বিফলতার অর্থে সরকারকে তথা সরকারের প্রতিরোধকে বিপর্যস্ত ও পরাস্ত এবং রাজনৈতিকভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সূচিত ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় তথা শেষ ও বিজয়ী পর্ব স্তিমিত হয় নাই।

১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারী বার লাইব্রেরীতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণের ছাত্র সমাবেশে ঐ পরিষদের ১৪৪ ধারা ভংগ না করার সিদ্ধান্ত ছাত্রদের দ্বারা প্রত্যাখানের এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীর দ্বিপ্রহর শেষে গুলিবর্ষণের পর ২২শে ফেব্রুয়ারী হরতাল ও গায়েবী জানাজার কর্মসূচী প্রদানে দায়িত্ব বহনে অস্বীকৃতির পর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন থেকে বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

তবু এটা অনস্বীকার্য যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভাষা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। তিন সপ্তাহের আয়ত্বে আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া • সত্ত্বেও পরিষদ তার সর্বদলীয় সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আন্দোলনকে সফল করার ভূমিকাই পালন করেছিল।

পক্ষান্তরে, ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে ছাত্র সমাবেশে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৯৪৮ সালের মার্চের পর থেকে স্থিমিত ও নির্বাপিত প্রায় ভাষা আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে ছাত্র সমাবেশে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভংগ না করার সিদ্ধান্তকে পর্যদন্ত ও পরাভূত ক'রে ২১শে ফেব্রুয়ারী মিছিল সহকারে ১৪৪ ধারা ভংগ ক'রে মিছিলকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাংগণে সমবেত হওয়ার দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছিল। ঐ মিছিল ও সমাবেশে গুলিবর্ষণের পর ২২শে ফেব্রুয়ারীর হরতাল ও গায়েবী জানাজার কর্মসূচীতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি নিজ নামে ২২শে ফেব্রুয়ারীর হরতাল, গায়েবী জানাজা ও মিছিলের আহ্বানে প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে ২২শে ফেব্রুয়ারী হরতাল, গায়েবী জানাজা ও মিছিল বাস্তবায়িত ক'রে ভাষার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সূচিত আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন ক'রে আন্দোলনের অভ্যুত্থান জোয়ারে মিশে গিয়েছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারীর ২০-২৫ হাজার লোকের গায়েবী জানাজা, তার মিছিল এবং মিছিলের উপর গুলিবর্ষণের পর মিছিল ও আন্দোলন আরো ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ ক'রে দেশব্যাপী অভ্যুত্থানে ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হওয়ার এবং সেই দুর্জয় শক্তির কাছে সরকারের শক্তি

পরাজিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বা যে কোনো কমিটির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

এই ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি তথা ঐ কমিটি সূচিত ও সংগঠিত ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে তার মহান লক্ষ্য অর্জন ক'রে পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী অবস্থা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিজয় ছিল বাঙ্গালী জাতির বিজয়। কারণ, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীকারের স্বীকৃতি। রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত বিন্যাসে এর রূপ কি হবে? শাসকরা রাষ্ট্রীয় কঠোমো আগের মত রাখতে পারে কেবল মাত্র যদি বাঙ্গালীরা তা মেনে নেয়।

কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানকে ধর্মীয় জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলে মনে করত। ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের ফলে সে ভিত্তি ধ্বংস হয়ে নেই এবং সে রাষ্ট্রের নতুন ভিত্তি যে কেবল বাঙ্গালী জাতির পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বের ভিত্তিতে হতে পারে এমন চিন্তা তারাই করতে পারেন যারা মনে করেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালী জাতির বিজয়। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করত যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠরা মুসলমান ও সেই মুসলমানরাই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ও প্রধান প্রবক্তা, তাই তারা সব অবস্থাতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত থাকতে চাইবে। এর অর্থ কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও তার বিজয়কে বোঝে নাই। ভাষা আন্দোলন কেবল বিজয়ী হয় নাই, ভাষা আন্দোলন ছিল একটা জাতির আন্দোলন। তাই ভাষা আন্দোলনের বিজয় হল জাতির বিজয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের আগে আওয়ামী লীগও মনে করত পূর্ব পাকিস্তানের মানদুশরা প্রধানত মুসলমান। তারা মনে করতেন মুসলমান বলেই কেবল মানদুশরা পাকিস্তান চেয়েছিল। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন যখন আওয়ামী লীগকে ছাড়াই কেবল হতেই পারল না, বিজয়ীও হল তখন তারা বুঝলেন এর কারণ পূর্ব পাকিস্তানের মানদুশরা প্রধানত বাঙ্গালী।

তাহলে কি এ দেশের মানুষরা ভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলায় হয়েছে ? না কি এ দেশের মানুষরা বাংলায় বলেই তারা তাদের ভাষার জন্য এমন একটা আন্দোলন করতে পেরেছে এবং তার জন্য বিজয়ীও হয়েছে ?

এ দেশের মানুষরা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের, এমন কি তাদের সমর্থিত পাকিস্তান আন্দোলনেরও অনেক আগে থেকে বাংলায় হয়ে বসে আছে। তারা যেমন একটা জাতি তেমনি অবিভক্ত উপমহাদেশে আরো অনেক জাতি ছিল এবং তাদের মতই সে সব জাতির লোকেরা প্রধানত হিন্দু বা প্রধানত মুসলমান ছিল না এই বাস্তবতাকে কেউ বুঝতে ও অবলম্বন না করতে পারার কারণেই যে বুর্জোয়া ধর্মের নামে ও ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে দু-দুটো রাষ্ট্র করতে পেরেছিল এ কথা কমিউনিস্টরা সে দিন যেমন বোঝেন নাই, তেমনি বোঝেন নাই ১৯৫২ সালে, এমন কি ১৯৭১ সালেও।

১৯৫২ সালের পর পাকিস্তানের শাসকরা যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেয় বা বাংলায়ীদের পূর্ণ স্বাধীন শাসনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকাঠামোকে পূর্ণগঠিত না করে বা বাংলায়ীদের ওপর অর্থনৈতিক বৈষম্য অব্যাহত রাখে তাহলে বাংলায়ীরা ঐ শাসকদের রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করবে, এবং শাসকরা যাতে পূর্বপাকিস্তানে আর প্রাধান্য না থাকতে পারে তার জন্য বাংলায়ীরা যে আর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে সাধারণভাবেও পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন রাখবে না তা প্রমাণ হয়েছে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেই।

জাতিকে না বোঝার জন্য এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এ দেশের বাস্তবতাকে বোঝে নাই বা একই কথা, এ দেশের বাস্তবতাকে না বোঝার জন্য জাতিকে বোঝে নাই। অবশ্য ১৯৬৬ সালের পর কমিউনিস্টরা বাস্তবতা বুঝতে থাকে কিন্তু, চীন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাইনকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করতে গিয়ে আবার দূরে সরে যায়। তাই এ দেশের জাতি ভিত্তিক বাস্তবতা বুঝেও তারা সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারে নাই। তাই ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ তথা আমলা মুনসুদ্দিন বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছিল। ১৯৪৭ সালে মুসলমান আমলা মুনসুদ্দিন বুর্জোয়ারা ধর্মের নামে আর ১৯৭১ সালে বাংলায়ী আমলা মুনসুদ্দিন বুর্জোয়ারা বাংলায়ীর নামে নিজেদের রাষ্ট্রই গঠন করেছিল।

শেষ বিশ্লেষণে এবং বাস্তবেও জাতির দেশ কোনো না কোনো শ্রেণীরই রাষ্ট্র। বাংলাদেশ বাংলায়ীদের দেশ হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্র যেমন ১৯৭১ সালে, তেমন আজও আমলা-মুনসুদ্দিনদেরই রাষ্ট্র। বাংলায়ীরা তাদের একটা

দেশ জেরেছিল মুখ ও শাস্তির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। বুদ্ধিজীবীরা যদি জাতিকে তা না দেয় বা দিতে না পারে তাহলে জাতির মধ্যে যারা সবচেয়ে নিষ্পীড়িত, সবচেয়ে দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন, এবং উৎপাদন উপাহীন তারা রাষ্ট্র গঠন ক'রে জাতির আকাংক্ষা পূরণ করবে।

ভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে জাতিসত্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, অর্থাৎ বাংলাদেশে বাংলালী বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই বাংলালী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বাংলালী কৃষক ও অন্যান্য প্রগতিশীল বাংলালী শ্রেণীগুলির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাস্তবতার উদ্ভব ঘটেছে। জাতিসত্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও জাতির আজ যে অবস্থা হয়েছে, জাতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার জন্য বুদ্ধিজীবীরা তথা বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রই দায়ী। জাতির বর্তমান অবস্থায় জাতির জন্য বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র উৎখাত করা ও তার জায়গায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে জনগণের তথা জাতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

সেটা যেদিন হবে সেদিনই কেবল ভাষা ও একুশের আন্দোলন যথাযোগ্য ও পূর্ণ মর্যাদা পাবে। জাতিও ভাষা ও একুশের আন্দোলনকে যথাযোগ্য ও পূর্ণ মর্যাদাই দিতে চায়। সেটা সম্ভব হচ্ছে না যেহেতু দেশ ১৯৭১ থেকে বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। ভাষা ও একুশের আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতি হল জাতির যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের শাসন, তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

এ ছাড়া, বাংলাদেশে বাংলালীদের ভাষা ও স্বাধীকারের অর্থাৎ জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ফলে উপমহাদেশে এমন একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে যার অস্তিত্ব জাতিসত্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকারের নীতিতে জাতির আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের ভীতি ও আতঙ্কের এবং জাতিসত্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকারের নীতিতে জাতির পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকামী নীতিগুলির জন্য উৎসাহ প্রেরণা ও জাতি ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জীবন্ত উদাহরণ হয়ে থাকবে।

উপমহাদেশে এই বাস্তবতার কারণে উপমহাদেশের বিশেষ ক'রে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা জাতিসত্তা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় বাস্তবতাকে বাংলালী জাতিসত্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে মেনে নেবে না। জাতিসত্তার বিজয়ের ফলে জাতিগুলির মধ্যকার শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে এবং আরো হবে।

পরিশিষ্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৯৫১ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখ সম্বলিত এই প্রারকলিপিটি পাকিস্তান গণপরিষদের সকল সদস্যদের কাছে ও পাকিস্তানের সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাঠিয়েছিল :

To

Member, Constituent Assembly
Karachi, Pakistan.

Sir,

We, the students of Dacca University, who initiated the language movement in East Bengal three years ago who are now more determined than ever to secure for Bengali the status of state language of Pakistan, will take this opportunity, while you are all assembled at Karachi, to press once more our legitimate claim.

The movement is going to be pretty old and it is unfortunate that while our whole energy should be harnessed in nation building activities, the Central Government in refusing to accept Bengali as a prospective state language has created distrust and apprehension in the minds of the majority of Pakistani People.

The apprehension is legitimate and until and unless it is removed it is sure to alienate a people without whose whole-hearted co-operation the dreams of unity and solidarity will never materialise.

Out of the Principle of self-determination came Pakistan and the young state is still struggling to achieve freedom in the real sense of the term. To be completely free, materially and intellectually, a long way is still to be traversed and as one of its first obstacles the formidable weight of English language is to be lifted to make room for languages of the people. No free people can afford to neglect its mother tongue which alone is efficient to help develop the intellectual faculties inherent in every man. The domination of an alien language is the worst kind of domination and most efficient to keep a people servile; and the British knew this when they ousted Persian and introduced English in the early part of the nineteenth century.

In the early months of independence the official circles in Karachi were talking of Urdu in terms of the

to penetrate the brains of our leaders. There must be something wrong somewhere. Otherwise this unjust and stepmotherly attitude of the Centre towards the province of the golden fibre is difficult to explain.

The dreamers of Karachi deaf to the groan of the starving primary school teachers of East Bengal are squandering thousands of rupees over Arabic Centres in the province. They are lending every possible support to Urdu with the fond hope that someday it will replace English and are playing the mischievous game of imposing Arabic script over Bengali. We the students of Dacca University, claiming the immediate implementation of the provincial policy in the matter of language and demanding Bengali to be the state language of Pakistan have given a tough fight and are prepared to fight to the last. We shall never accept Urdu as the only state language. We are sworn to expose the great conspiracy which aims at reducing East Bengal to the state of a colony.

We remind them and the peoples representatives who are at the helm of the affairs that until and unless the claim of Bengali is fully established in the province as well as in the Centre, the students of Dacca University shall not rest.

M. Amjad

Date.....April 1951

Convenor,

Dacca University

State Language Committee of Action

পরিশিষ্ট-২

১৯৪৭

- জুলাই, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়া উদ্দিন আহমদ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুরোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত।
- ডক্টর শহীদুল্লাহর ভিন্নমত প্রকাশ।
- সেপ্টেম্বর, তমদ্দুন মজলিশের বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবী।
- ডিসেম্বর, ভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম সভা।

১৯৪৮

- ফেব্রুয়ারী, পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলার দাবী নাকচ।
- ২৬ ফেব্রুয়ারী, এর প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায়ের ধর্মঘট পালন। দেশব্যাপী প্রতিবাদ।
- ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট, কয়েকদিন ব্যাপী ঢাকায় ছাত্র আন্দোলন, পরিষদ ঘেরাও।
- ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ সাহেবের ভাষণ, 'কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।
- ২৪শে মার্চ জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন সভায় ভাষণ রেসকোর্সের মাঠে ঘোষিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, ছাত্রদের প্রতিবাদ।
- ১৯৪৮ মার্চের পর ১৯৫০ ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভাষার জন্য কোনো আন্দোলন হয় নাই।

১৯৫০

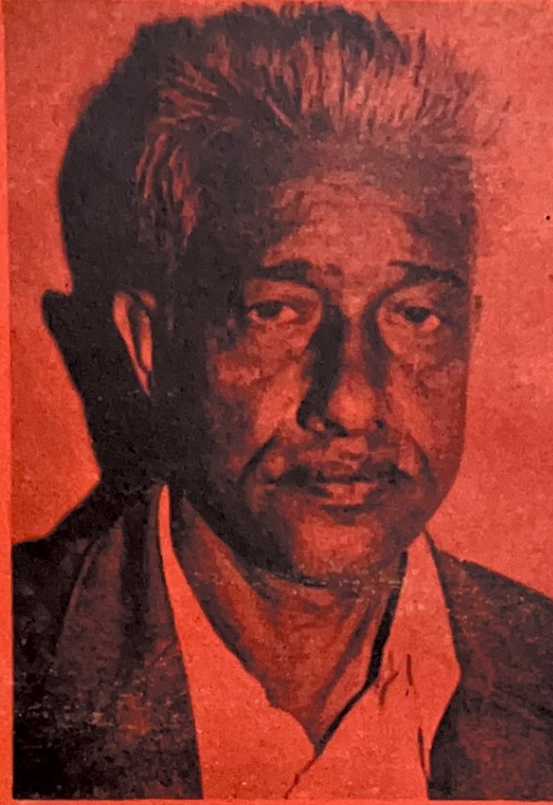
- ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন।
- এপ্রিল, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পতাকা দিবস পালন।

১৯৫১

- বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির দেশব্যাপী ১১ই মার্চ পালনের আহ্বান।
- এপ্রিল, পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্যদের কাছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবীতে স্মারকলিপি প্রেরণ।
- সেপ্টেম্বর, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির সর্বত্র রাষ্ট্রভাষা স্থানীয় কমিটি গঠনের আহ্বান।

১১৫২

- ২৭শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের পল্টনে ময়দানে ভাষণ, 'কেবলমাত্র উদ্‌ই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'
 - ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীক ধর্মঘট পালন ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান।
 - ৩১শে জানুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠন।
 - ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, পরবর্তীতে সভা ও মিছিল। ঐ সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী বাংলার দাবীতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
 - ২০শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভংগ না করার সিদ্ধান্ত।
 - ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছাত্র সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভংগ না করার সিদ্ধান্ত বাতিল। ১৪৪ ধারা ভংগ। বিকাল ৩ টায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গুলিবর্ষণ। ৪ জন ঘটনাস্থলে নিহত ও শতাধিক আহত হন।
- সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ২২শে ফেব্রুয়ারী গায়েবী জানাজা ও হরতাল আহ্বানের অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির গায়েবী জানাজা ও হরতালের আহ্বান।
- ২২শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে দশ সহস্রাধিক লোকের গায়েবী জানাজা। মিছিল। মিছিলে গুলিবর্ষণ। ২ জন নিহত ও অসংখ্য আহত। মিছিলের আরো ব্যাপ্তি। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সর্বত্র হরতাল ও মিছিল। মনিং নিউজ অফিস ভস্মীভূত। সরকার অকেজো হয়ে যায়।
 - ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ঢাকায় ও সমগ্র দেশে পূর্ণ হরতাল ও মিছিল। জনগণের অভ্যুত্থানে সরকারের পরিপূর্ণ পরাজয়।
 - ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ঢাকা ও দেশব্যাপী হরতাল, মিছিল।
 - ২৫শে ফেব্রুয়ারী, পুনরগঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত।
 - ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ধর্মঘট প্রত্যাহার।



ভাষা-আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হলো ২১শে ফেব্রুয়ারী। ওই দিনের ও পরের দিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের জয়-পরাজয়। ওই দিনটির ডাক দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি—যার আহ্বায়ক ছিলেন এই গ্রন্থের লেখক আবদুল মতিন। এই কমিটি সেদিন আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিল—১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্যে ছাত্তরের একটিভ করেছিল এবং ২১ ফেব্রুয়ারী বিকেলে গুলির পর ২২শে ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট ও গায়েবী জানাজার ডাক দিয়েছিল।

আবদুল মতিন পরবর্তী কালে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে যোগ দেন। কৃষকদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন। ১৯৬৯ সালে তিনি কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 'লাল টুপি' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং লক্ষ-লক্ষ কৃষককে এই সংগঠনের পতাকা-তলে একীভূত করার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি দেশে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, '৭১-এর পর সামিল হয়েছিলেন আওয়ামী শাসন-বিরোধী যুদ্ধে। ১৯৭২ সালে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়ে ৫ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। বর্তমানে তিনি কমিউনিষ্টদের একা প্রচেষ্টায়, সেই সঙ্গে কৃষক-দের সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।